# কার্ল মার্কসের জীবন

কমলকুমার সান্যাল

# কার্ল মার্কসের জীবন





কমলকুমার সান্যাল

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

প্রকাশক—শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ





প্রচ্ছদ—রমাপ্রসাদ গুপ্ত

মূল্য—ছয় টাকা

মুদ্রক—চিত্তজিৎ দে
অরোরা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

নৃপেন্দ্রনাথ মল্লিককে

# ভূমিকা

বিদেশে কার্ল মার্কসের জীবনের ওপর লিখিত অনেক বই থাকলেও বাংলায় মার্কসের জীবন নিয়ে বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। মস্কো থেকে অবশ্য বাংলায় মার্কসের জীবন নিয়ে আলোচনার বই আছে। অমল দাশগুপ্তের লিখিত কার্ল মার্কসের জীবন সম্পর্কিত বইটি খুবই মূল্যবান। এই বইটি সাধারণ মানুষের বুঝবার সুবিধার জন্যে লিখলাম। বইটি লিখতে সাহায্য নিয়েছি মস্কো থেকে প্রকাশিত মার্কস এঙ্গেলস-এর রচনা সংকলনের অনুবাদ, লেনিনের সংগৃহীত রচনা সংকলনের অনুবাদ এবং স্তেপনেভার কার্ল মার্কস। বইটির শেষ অংশে মার্কসের লেখা ও চারটি চিঠির অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। বইটি পড়ে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছেন জানতে পারলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। ছোট হলেও পরিশ্রম সাধ্য বইটি একান্ত সুহৃদ প্রকাশক বন্ধু শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষের হাতে তুলে দিলাম।

মার্চ, ১৯৮৩ ক. কু. সা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন

কিশোরদের জন্য লেখকের আর একটি জীবনী গ্রন্থ

## কার্ল মার্কসের জীবন

উনবিংশ ও বিংশ শতকে বিশ্বের চিন্তা জগতে যে ব্যক্তি সব থেকে বেশি আলোড়ন এনেছিলেন এবং যাঁর মতবাদ দ্বারা বিশ্বের জন গোষ্ঠী সব থেকে বেশী প্রভাবিত হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম কার্ল মার্কস। মহান কার্ল মার্কস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা। যে মতবাদ তিনি প্রচার করেছিলেন সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের আওতায় বর্তমানে বাস করছেন বিশ্বের এক তৃতীয়াংশের অধিকমানুষ। যে সমস্ত রাষ্ট্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি তার মধ্যে অনেক দেশের মানুষ স্বৈরতন্ত্র-ধনতন্ত্র ও আধা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ। এমন করে মানুষকে প্রভাবিত করতে আর কোন মানুষ পারে নি। শিল্পে সাহিত্যে-চিন্তাজগতে-মনোবিজ্ঞানে এবং মননের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের জন্যে মার্কস দেখিয়েছেন মুক্তির আলো। সেই আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে পৃথিবীর দেশে দেশে, গ্রামে-নগরে বন্দরে। অত্যাচারিত-লাঞ্ছিত-বঞ্চিত ও শোষিত মানুষ পেয়েছে তাদের মুক্তির সঠিক নিশানা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক দার্শনিক হলেন কার্ল মার্কস। মানুষকে ভালবাসার আবেদন বা ব্যক্তিগত ভাবে কিছু মানুষের উপকারের মধ্যেই তাঁর চিন্তা সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। শোষিত ও অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির, তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার এবং মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠার জন্যে সারাজীবন তপস্যা করে গেছেন।

কঠোর সাধনা ও তপস্যার ফলে উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন এক মতবাদ। যে মতবাদ মানুষের মুক্তি পথের দিশারী স্বরূপ।

## জন্ম ও কিশোর

কার্ল মার্কসের জন্ম ১৮১৮ সালের ৫ই মে জার্মানির রাইন জেলার ট্রিয়ারে। মার্কসের পিতার নাম হেনরিখ মার্কস। তিনি আইনজীবী ছিলেন। মার্কসের মায়ের নাম হেনরিয়েটা। মার্কস পরিবার জাতিতে ছিলেন ইহুদি। ১৮১৫ সালে নেপোলিয়ানের পতনের পর রাইন জেলা প্রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। জার্মানির ৩৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাশিয়া ছিল সব থেকে প্রতিক্রিয়াশীল। শাসক সম্প্রদায় ছিল স্বেচ্ছাচারী। সমাজ কাঠামোছিল সামন্ততান্ত্রিক। ভূস্বামীদের ও পুলিশের ক্ষমতা ছিল সব থেকে বেশি আর সেই সঙ্গে ছিল গরীব জনসাধারণের ওপর অবাধ অত্যাচার। প্রাশিয়ার আইনে ইহুদিরা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। কার্ল মার্কসের পিতা হেনরিখ মার্কস জীবন ও জীবিকার স্বার্থে জন্ম-গত ধর্ম ত্যাগ করে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ফরাসী বিপ্লবের যে প্রভাব তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল সেই প্রভাব থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। পুত্রদের মনেও তিনি জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়ে ছিলেন। হেনরিখের ছিল চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। বড় ছেলে ডেভিড অল্প বয়সেই মারা যায়। ডেভিডের মৃত্যুর পর মেজ ছেলে কার্ল পান প্রথম সন্তানের আদর ও মর্যাদা। কার্ল পিতামাতার বাধ্য ছিলেন এবং উভয়ের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁকে ঘিরেই পিতামাতা বড় স্বপ্ন দেখতেন। তাঁদের

সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। বিশ্বের মেহনতী মানুষের জনকের সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন।

বাল্যকালে কার্ল স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন। তাঁর ছিল প্রবল জ্ঞান-পিপাসা। জ্ঞান-পিপাসার প্রবল আকর্ষণেই তিনি বিভিন্ন বিষয় পড়তেন এবং বুঝবার চেষ্টা করতেন। ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব এবং সমাকালীন সমাজ জীবন সম্পর্কিত বই তিনি বেশি পড়তেন। তাঁর অধ্যবসায় ছিল অসাধারণ। কার্লের জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। এছাড়া বাল্যবন্ধু এডগার এবং সহোদর বোনের বান্ধবীর পিতা লুডভিগ ফন ভেস্টফালেন তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। য়েনির পিতার কাছেই তিনি প্রথম শুনেছিলেন ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের কথা। বাল্যকাল থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবার ফলে তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও মৌলিকচিন্তা শক্তি। ১৮৩০ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত জন্মভূমি ট্রিয়ারের স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। স্কুলের পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও তিনি প্রচুর বই পড়তেন। পড়ার ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিছার ছিল না। হাতের কাছে যাই পেতেন তাই পড়তেন। তবে ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্য-বিষয়ক বই পড়তে ভালবাসতেন। যে বই পড়তেন তা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন এবং বইয়ের মূল বিষয়টি অনুধাবন করবার চেষ্টা করতেন। যা পড়তেন তা নিয়ে ভাবতেন। এর ফলেই চিন্তাশক্তির বিকাশ স্ফুরিত হতে থাকে।

ভবিষ্যতে তিনি কোন্ দিকে যাবেন তাঁর ভাবনা চিন্তা কোন্

দিকে মোড় নেবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় স্কুল জীবনেই। স্কুল জীবনে তিনি একটি রচনা লিখেছিলেন যার নাম 'জীবিকা নির্বাচন সম্পর্কে যুবকের ভাবনাচিন্তা।' এই রচনাটি ছিল তাঁর শেষ পরীক্ষার রচনা। স্কুলের প্রধান ভিটেনবাখ কার্লকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর লেখা রচনা প্রধানকে মুগ্ধ করেছিল। কার্ল বাল্যকাল থেকেই প্রগতিশীল ভাবধারার শরিক ছিলেন। কার্ল লেখাপড়াকে আত্মিক বিকাশের বিষয় বলে মনে করতেন। সে কারণেই সহপাঠীদের তুলনায় তার আত্মিক বিকাশের গুণগতমান অনেক উন্নত ছিল। উক্ত রচনায় তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের কথা বলেন নি। জীবনের লক্ষ্য হিসেবে তিনি বলেছেন—মানব-জাতির সেবা। বলেছেন—"আমরা যদি এমন জীবিকা নির্বাচন করি যার আওতায় আমরা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে পারি, তা হলে তার ভারে আমরা নুইয়ে পড়ব না, যেহেতু এ হল সকলের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ, তখন নগণ্য, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর আনন্দের বোধ আমাদের থাকবে না, আমাদের সুখ হবে কোটি কোটি মানুষের সম্পদ।"

ভবিষ্যতে কার্ল যে মানব জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং সর্বহারাদের যুক্তির পথ দেখাবেন তার ইঙ্গিত মেলে রচনাটির মধ্যে। বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। বরং ক্রমে তা উন্নত হয়েছে, বিমূর্ত ভাব মূর্ত হয়েছে, জ্ঞানের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে।

মার্কসদের পরিবার ছিল বড়। খুব একটা আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁদের পরিবারে ছিল না। পিতা হেনরিখ পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার প্রতি নজর দিতেন। পিতার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও বিদ্যানুরাগের

প্রভাবে কার্ল বড় হয়েছিলেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও কার্লের বিদ্যানুশীলনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় নি।

## উচ্চশিক্ষা

মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে কার্ল ১৮৩৫ সালের অক্টোবরে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পড়বার জন্যে ভর্তি হন। এই সময় তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের ওপর অধ্যাপকদের ভাষণ শুনতেন। এক বছর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নেন তারপর চলে আসেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইন শাস্ত্র পড়বার কালেই তিনি দর্শন বিজ্ঞানশাস্ত্রে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। বার্লিনে তিনি যখন পড়তে আসেন তখন হেগেল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় আলো করে-ছিলেন। হেগেলকে ঘিরে অনেক তরুণ ছাত্র দর্শনের আলোচনায় মগ্ন। কার্ল মার্কসও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হেগেল-পন্থীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। হেগেলপন্থীদের একটি সংগঠন ছিল। সংগঠনটির নাম ডক্টর্স ক্লাব। মার্কস এই ক্লাবের সদস্য হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সদস্যদের মধ্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মার্কস হেগেলের দ্বান্দ্বিক বিচার পদ্ধতি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুধাবন করেন। সমাজ বিকাশের এবং বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাকে হেগেল দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিচার করতেন। এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা মার্কসকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু হেগেলের

দর্শন চিন্তার মধ্যে ছিল স্ববিরোধিতা। বিশ্ব সৃষ্টির মূলে তিনি দেখেছেন পরম ভাবের বিকাশ। অর্থাৎ হেগেলের দর্শন চিন্তার মূল কাঠামোটা দাঁড়িয়েছিল ঈশ্বর বিশ্বাসের ওপর। রাষ্ট্র সম্পর্কিত আদর্শবাদে তিনি স্পষ্টই বলেছেন it is the march of god on earth. হেগেল তাঁর দর্শনে সর্বেশ্বর বাদের (paenbheism) কথা বলেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ ও জীব থেকে অতিবর্তী আবার জগৎ ও জীবে অন্তর্ব্যাপী। স্বভাবতই হেগেলকে কেন্দ্র করে দুটি দল গড়ে উঠেছিল—একটি রক্ষণশীল অপরটি প্রগতিশীল। প্রগতিশীল মতবাদীরা হেগেলের বিশ্ববীক্ষার দ্বান্দ্বিক নীতিটি গ্রহণ করেছিলেন। মার্কসও এই দলে ছিলেন।

এই সময়ে মার্কস তাঁর ডক্টরেট থিসিস রচনার কাজে নিমগ্ন হন। তাঁর থিসিসের বিষয় হলো ডেমোক্রাটদের প্রাকৃতিক দর্শন ও এপিকিউরাসের প্রাকৃতিক দর্শনের প্রভেদ। এই থিসিসে মার্কসের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় নিহিত আছে। উক্ত দুই দার্শনিকের ধর্ম ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বস্তুবাদী চিন্তাধারার ওপর নতুন আলোকপাত করেন। হেগেলের চিন্তাধারার বিরুদ্ধতা তিনি স্পষ্ট ভাবে করেছেন তাঁর থিসিসে। মার্কস আগেই অনুমান করেছিলেন তাঁর থিসিসের যথার্থ মূল্যায়ন হবে না বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাই তিনি থিসিসটি জমা দেন ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হন ১৮৪১ সালে।

১৮৩৫-এ মার্কস যখন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন তখন তিনি হেগেলের কাছে গ্রীক ও লাটিন সাহিত্য রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক শাস্ত্রের পাঠ নেন। এ সবই পরবর্তীকালে তাঁর বিশেষ কাজে লেগেছিল। মার্কসের ইচ্ছে ছিল অধ্যাপনা করার। কিন্তু সে ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয় নি। প্রাশিয়ার সরকার প্রগতিশীল

অধ্যাপকদের বিতাড়িত করতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি বুঝতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রচারের কোন স্থান নেই। বাধ্য হয়ে তিনি অন্য পথে পা বাড়ান। মার্কসের নতুন পথে পা দেওয়া যে বিশ্বের জনগণের পক্ষে শুভ হয়েছিল তা বলা বাহুল্যমাত্র।

## বিবাহ ও সংসার

মার্কসের পিতৃবন্ধু লুডভিগ ফন ভেস্টফালের কন্যার এবং মার্কসের দিদি সোফিয়ার বন্ধু য়েনীর সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই মার্কসের পরিচয় ছিল। লুডভিগ মার্কসকে তাঁর গ্রন্থাগার ব্যব র করতে দিয়েছিলেন। সেই সূত্রেই য়েনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। য়েন মার্কসের থেকে চার বছরের বড় ছিলেন। বয়সের ব্যবধান উভয়ের বন্ধুত্বে কোন বাধার সৃষ্টি করে নি। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রেমে রূপান্তরিত হয়। য়েনীর প্রতি প্রেমের উপলব্ধি যখন মার্কসের হয় তখন তাঁর বয়স সতের বছর। ১৮৩৬ সালে উভয়ের মধ্যে বাগদান হয়। কিন্তু এরপর দীর্ঘসময় ছয় সাত বছর উভয়ের বিরহের মধ্যে কাটে।

১৮৪৩ সালের ১৯শে জুন মার্কস য়েনীকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর দুজনে সুইজারল্যাণ্ড যান হনিমুন বা মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে। মার্কসের সাংসারিক জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা কোনদিনই ছিল না। ১৮৪৩ সালের অক্টোবরে মার্কস সস্ত্রীক প্যারিসে যান। কিন্তু প্যারিস সরকার তাঁকে বিতাড়ন করে। ১৮৪০ সালে স্ত্রীকে নিয়ে চলে আসেন ব্রাসেলসে। প্রায় সহায় সম্বলহীন অবস্থার মধ্যে ব্রাসেলসে আসতে হয়। বেলজিয়াম সরকার রাশিয়ার চাপে মার্কসকে ব্রাসে-লস থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করে। এই খবর পেয়ে তিনি প্রাশিয়ার

নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন। তিনি ব্রাসেলসেও চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে স্থায়ীভাবে থাকেন ১৮৪৯ সাল থেকে।

১৮০১ সাল থেকে মার্কস তাঁর লেখার জন্যে কিছু কিছু অর্থ পেতে থাকেন। মার্কসের মোট সন্তান সংখ্যা ছয়। এর মধ্যে এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা। একমাত্র পুত্র এডগার এবং গুইডো, ফ্রান্‌ৎসিসকা সকলেই অল্প বয়সে মারা যায়। প্রথম দুই কন্যা শিশুবয়সেই মারা যায়। একমাত্র পুত্র এডগার মারা যায় আট বছর বয়সে। এই পুত্রটি পরিবারের সকলের প্রিয় পাত্র ছিল। অপুষ্টি এবং প্রায় বিনা চিকিৎসায় পুত্রটি মারা যায়। ছেলেকে বাঁচানোর জন্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বহু চেষ্টা করে। মার্কস অনেক দিন রাত জেগে ছেলের শয্যাপার্শ্বে কাটান। সব চেষ্টাই বিফলে যায়। এডগারের মৃত্যুতে মার্কস মনে খুব আঘাত পেয়েছিলেন। ছেলেটি মারা যায় ১৮৫৫ সালে। এডগারের মৃত্যুর পর মার্কস তাঁর সব থেকে প্রিয় বন্ধু এংগেলসকে লেখেন—"বেচারা মুশ (ডাকনাম) আর ইহজগতে নেই। এই ভয়ংকর সময় তোমার বন্ধুত্ব যে আমাদের ভার কত লাঘব করেছে তা আমি কখনো ভুলবো না। বাচ্চাটার জন্যে আমার শোক যে কত গভীর তা তুমি বুঝতে পারছ!"

মার্কস জীবনে অনেক শোক ও কষ্ট পেয়েছেন। সংসারে অভাব ও দারিদ্র থাকলেও নিরবিচ্ছিন্ন সুখ ছিল। স্ত্রী য়েনী কখনো কোন অনুযোগ বা অভিযোগ করেন নি। হাসিমুখে তিনি সব কিছু মেনে নিতেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। চরম দুঃখ-কষ্ট এবং দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কেটেছে। জীবনের অধিকাংশ দিনই তাদের রুটি আর আলুর ওপর নির্ভর করে কেটেছে। অর্দ্ধাহারে এবং অনাহারেও তাঁদের দিন কেটেছে। অনেকদিন নিজের

বাইরে বেরোবার পোষাক ভাড়া দিতে হয়েছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসায় কখনো চিড় ধরেনি। বরং উভয়ের গভীর প্রেমানুভূতি সমগ্র পরিবারটিকে সুখের চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। মার্কস যে তাঁর স্ত্রীকে কতখানি ভালবাসতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্ত্রীকে লেখা একটি পত্র থেকে। ১৮৫৬ সালে য়েনী নিজের অসুস্থ মাকে দেখতে ট্রিয়ারে গেলে মার্কস তাঁকে এক চিঠি দেন। সেই চিঠিতে লেখেন—"কেবল স্থানই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে. একথা অবিসংবাদিত যে জগতে নারী অনেক, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্দরীও বটে। কিন্তু এমন মুখ আর কোথায় পাব যার প্রতিটি রেখা এমন কি প্রতিটি বলিরেখা আমার ভেতরে জাগিয়ে তুলতে পারে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রবলতম ও মধুরতম স্মৃতি। এমন কি আমার অশেষ দুঃখকষ্টের, আমার অপরিশোধনীয় ক্ষতিও আমি পাঠ করে থাকি তোমার মধুর মুখাবয়বে......"

লণ্ডনে গিয়ে মার্কস পড়লেন চরম আর্থিক সংকটে। সেখানে যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়ির মালিক মার্কসের অনুপস্থিতিতে ফ্ল্যাটের ভাড়া চায়। কোন অর্থ না থাকায় আদালতের দুই কর্মচারী এসে মার্কস পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি এমনকি বাচ্চার দোলনা খাট, মেয়েদের খেলনাপাতি ক্রোক করে। ছেলে-মেয়েরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পরেরটুকু মার্কস পত্নী য়েনীর কথাতেই শোনা যাক—"পরের দিন আমাদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হল। ঠাণ্ডা মেঘলা ও বাদলার দিন। আমার স্বামী আমাদের জন্যে ঘরের খোঁজ করেন, কিন্তু চার ছেলেমেয়ে শুদ্ধ আমাদের কেউ যেতে দিতে চায় না। অবশেষে এক বন্ধু আমাদের সাহায্য করলেন। আমরা বাড়ি ভাড়া শোধ করি! সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার

কারিতে আতঙ্কগ্রস্ত ওষুধের দোকানের মালিক, রুটিওয়ালা, মাংস-ওয়ালা ও গোয়ালারা যার যার বিল নিয়ে আমার ওপর অতর্কিতে হামলা জুড়ে দিল। তাদের বিল চুকিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তাড়াতাড়ি নিজের সবগুলো খাট বেচে দিই।

মনে করবেন না যে তুচ্ছ ব্যাপারের দরুণ এই কষ্টে আমি ভেঙ্গে পড়ি। আমি বেশ ভালো করেই জানি যে আমাদের সংগ্রামে আমরা মোটেই নিঃসঙ্গ নই এবং ভাগ্য এখনও আমার প্রতি প্রসন্ন—আমি স্বল্পসংখ্যক সেই ভাগ্যবতীদের একজন, কেননা আমার পাশে পাশে আছেন আমার প্রিয় স্বামী, আমার জীবনের অবলম্বন···কখনও সবচেয়ে ভয়ংকর মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস হারান নি, তাঁর অতি প্রাণবন্ত রসবোধ সর্বদাই বজায় থাকত।"

আজীবন সংগ্রামী এই মানুষটি ছিলেন শিশুর মত সরল। অন্যায় অবিচার আর শোষণের বিরুদ্ধে তিনি নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন। সেখানে তিনি কঠিন ও কঠোর। এবিষয়ে কোন আপোষ তাঁর ছিল না। অন্তর ছিল তাঁর সরল ও পবিত্র। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি খেলা করতেন। তাঁর বাড়িতে অন্য যে সব ছেলেমেয়ে আসতো তাদেরও নিজের সন্তানের মত স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। সকলের সঙ্গে তিনি খেলায় মেতে উঠতেন। শিশুদের অনুরোধে তিনি ঘোড়া হতেন আর তাঁর পিঠে শিশুরা উঠে বসত। শিশুদের তিনি নানা রকমের গল্প বলতেন। কখনো কখনো নিজেই জ্ঞানগর্ভ রূপ কথার গল্প বানিয়ে বলতেন।

নিজের কন্যাদের সঙ্গে স্বীকারোক্তির খেলা খেলতেন। সে সময়ে ইংল্যাণ্ডে এবং জার্মানিতে এ ধরনের খেলা খুব জনপ্রিয় ছিল।

মার্কস নিজে কয়েকটি স্বীকারোক্তি তৈরি করে কন্যাদের বলতে বলতেন। উধাহরণ দিলেই ব্যাপারটি বুঝতে সুবিধে হবে।

যে সদ্‌গুণের জন্যে আপনার কাছে সর্বাধিক মূল্য পায়

| | | |
|---|---|---|
| মানুষ | — | সারল্য |
| পুরুষ | — | শক্তি |
| নারী | — | দৌর্বল্য |
| আপনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য | — | একনিষ্ঠ লক্ষ্য |
| সুখ সম্পর্কে ধারণা | — | সংগ্রাম |
| দুঃখ সম্পর্কে ধারণা | — | পরবশ্যতা |
| দুর্ভাগ্য সম্ভব ক্ষমা করতে প্রস্তুত | — | সহজ বিশ্বাস প্রবণতা |
| সর্বাধিক বিতৃষ্ণা উদ্রেক করে | — | দাস মনোভাব |
| প্রিয় কাজ | — | বই হাতড়ানো |
| প্রিয় কবি | — | এস্কাইলাস, শেক্সপীয়র, গ্যেটে |
| প্রিয় গদ্যলেখক | — | দিদেরো |
| প্রিয় নায়ক | — | স্পার্টাকাস, কেপলার |
| প্রিয় নায়িকা | — | গ্রেটখেন্ |
| প্রিয় ফুল | — | ডাফনে, |
| প্রিয় রং | — | লাল |
| প্রিয় নাম | — | লরা, জেনী |
| প্রিয় খাদ্য | — | মাছ |
| প্রিয় সুভাষিত | — | Nihil humani a me alienum Puto —মানবিক কোন কিছুই আমার অনাত্মীয় নয়। |
| প্রিয় নীতি বাক্য | — | De omnibus dubitandum— সব ব্যাপারেই সন্দেহ করা। |

এই স্বীকারোক্তিমূলক খেলা থেকে মার্কসের অন্তরের মনোভাব সম্পর্কে অনেকখানি জানা যায়। কন্যাদের শিক্ষার ব্যাপারে মার্কস অত্যন্ত মনযোগী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কন্যাদের মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কন্যাদের পড়ে শোনাতেন 'হাজার একরাত', 'নিবেলুংদের গীতি', 'ডনকুইকজোট', 'হোমার,' শেক্সপীয়র', 'দান্তে', রবার্ট 'বানর্স', 'শেলি', 'গ্যেট', 'হাইনে' বালজাক প্রভৃতি। তবে শেক্সপীয়রের রচনা পরিবারের সকলের খুব প্রিয় ছিল। কন্যারা ছোটবেলা থেকেই শেক্সপীয়রের নাটকের এক একটি দৃশ্য মুখস্থ বলতে পারতো।

মার্কস শুধু জনক ছিলেন না। তিনি কন্যাদের কাছে ছিলেন বন্ধু এবং শিক্ষক। মার্কসের ছোট কন্যা এলেওনোরা যার ডাক নাম টুসি সে নিজের পিতার সম্পর্কে লিখেছে—"মানব প্রকৃতির চর্চায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের কাছে এটা আশ্চর্যের ঠেকবে না যে এমন অনমনীয় সংগ্রামী যে মানুষ. তিনি একই সঙ্গে হতে পারেন সকলের চেয়ে বেশি সহৃদয়, বেশি কোমল। তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, যে এত গভীরভাবে ভালবাসার ক্ষমতা তাঁর ছিল বলেই তিনি এমন দারুণ ঘৃণা করতে পারতেন ; বুঝতে পারবেন যে দান্তের মতো শক্তি সম্পন্ন তাঁর জ্বালাময়ী লেখনী যদি কাউকে স্থায়ীভাবে নরকে পাঠাতে পারতো, তবে তা একমাত্র এই কারণেই যে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান, বড়কোমল, বুঝতে পারবেন যে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রসিকতা যদি অম্লরসের মতো ক্ষয় করতে পারতো, তাহলে সেই একই রসিকতা আবার দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের সান্ত্বনাও দিত।"

বড় হয়ে তিন বোনই পিতার সংগ্রামের সাথী হয়। তাঁরা পিতামাতার শিক্ষার বড় হয়েছে। তিনজনেই সুশিক্ষিতা। কয়েকটি

বিদেশীভাষা তাঁরা জানতেন। বিশ্বের শিল্প-সাহিত্য এবং সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁদের সম্যক জ্ঞান ছিল। আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার জন্যে বড় কন্যা জেনি বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়াতেন। ছোট কন্যা এলেওনোরা ব্রাইটনে স্কুলে চাকরী নেয়। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তাকে চাকরী ছাড়তে হয়। তবে তিন কন্যাই পিতার বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং নিজেরাও সংগ্রামের শরিক হয়েছেন। মার্কসের অনেক লেখার কপি করে দিয়েছেন জেনি। পিতার নির্দেশে কন্যারা বিভিন্ন ব্যক্তিকে চিঠি লিখতেন। বড় ও মেজ কন্যা জেনি ও লরা ষাটেরদশকে শ্রমিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন। ছোট কন্যা এলেওনোরা সত্তরের দশকে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বড় কন্যা জেনি পেনিশ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া প্রাপক চিহ্ন গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক সবুজ ফিতের সঙ্গে। ইংল্যাণ্ডে গ্ল্যাডস্টোনের সরকারের বিরুদ্ধে মার্কস যে প্রচারাভিযান শুরু করেন তাতে জেনি অংশ নেন। প্রচারাভিজান ছিল বন্দী ফেনিয়াদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই সময় জেনি ফরাসী সংবাদ পত্রে এক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে আলোড়ন দেখা দেয়। এ সম্পর্কে মার্কস নিজেই বলেছেন —"এতে মস্ত সোরগোল সৃষ্টি হয়। বহু বছর ধরে বিদ্বেষ প্রসূত প্রত্যাখ্যান চালিয়ে যাওয়ার পর, অবশেষে গ্ল্যাড-স্টোন বন্দী ফেনিয়াদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে পার্লামেন্টের তদন্তে রাজী হতে বাধ্য হলেন।"

মার্কসের তিন কন্যার বিয়ে হয়েছিল যথাক্রমে জেনির সঙ্গে প্যারী কমিউনের সদস্য শার্ল লঁগের, লরার সঙ্গে পল লাফার্গের (ইনিও প্যারী কমিউনের সদস্য ছিলেন) এবং এলেওনোরার সঙ্গে

ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের নেতা এডওয়ার্ড এভেলিং-এর। জেনি ও লরা দুজনকেই স্বামীর সঙ্গে অশেষ দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়। ফ্রান্সে লরা ফরাসী শ্রমিক পার্টির সদস্যা হন এবং মার্কস বাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। স্বামী লাফার্গকে তিনি নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। মার্কসও এঙ্গেলসের অনেক রচনা তিনি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এঙ্গেলস লরার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। বড় কন্যা জেনি বেশিদিন বাঁচেন নি। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ১৮৮৩-র জানুয়ারী মাসে তিনি মারা যান।

ছোট কন্যা এলেওনোরা অল্প বয়স থেকেই পিতার কাজে সাহায্য করতেন। চিঠি পত্র লেখা, লেখার কপি করা, এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর পিতার লেখার পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা এলেওনোরা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে তিনি প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রচুর প্রবন্ধ লেখেন এবং পিতা ও এঙ্গেলসের স্মৃতিকথা রচনা করেন। মার্কসের শেষ জীবনে এলেওনোরা পিতাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে পিতাকে বিভিন্ন দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এতো গেলো মার্কসের কন্যাদের কথা। এবার স্ত্রী য়েনীর কথা কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। য়েনী ছিলেন মহিয়সী নারী। অসাধারণ বুদ্ধিমতী এই মহিলা। সেবা, নিষ্ঠা আর আত্মত্যাগে স্বামীকে মহান কার্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নিজে স্বামীর সেক্রেটারীর কাজ করতেন। মার্কসের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত খারাপ। সেই দুর্বোধ্য হাতের লেখা উদ্ধার করে প্রেস কপি তৈরি করতেন। ক্যাপিটাল-এর প্রথম

খণ্ডের কপি তিনি তৈরি করেন। স্বামীর হয়ে বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের চিঠি দিতেন। য়েনী ছিলেন সাহিত্য-শিল্প রসিক। তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের ও বিপ্লবী কর্মধারার খবর তিনি রাখতেন। রুশ বিপ্লব সম্পর্কে ইংরেজ সাংবাদিক রোলস্টনকে ভণ্ড ও শঠ বলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি।

য়েনী রূপে ও গুণে যেমন অসাধারণ ছিলেন তেমনি তাঁর আতিথেয়তা ছিল অতুলনীয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মার্কসের বাড়িতে আসতেন। আসতেন আরও অনেক জ্ঞানী গুণী। চরম দারিদ্রের মধ্যেও সকলকে তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করতেন। দারিদ্রের জন্যে পরিবারের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু তাদের মুখের হাসি কোনদিন মিলিয়ে যায়নি য়েনী সম্পর্কে এঙ্গেলস উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছেন। লিব্‌ক্লেখট লিখেছেন "মার্কসের স্ত্রী আমার ওপর প্রায় ততটাই প্রভাব বিস্তার করেন, যতটা করেন স্বয়ং মার্কস।...আমি সাক্ষাৎ পেলাম অপূর্ব মহিয়সী বুদ্ধিমতী নারীর, যিনি টেশসের তীরভূমিতে পরিত্যক্ত আমার মত এক নিঃসঙ্গ ভলান্টিয়ারকে মা ও বোনের দৃষ্টিতে দেখতেন। আমার করুণ ভবঘুরে জীবনে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমি সম্পূর্ণ বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পাই—এতে আমার কোন সন্দেহ নেই।" সকলেই য়েনীর স্বভাবে মুগ্ধ হতেন। মার্কসকে সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানই সব থেকে বেশি।

মার্কসের পরিবার সম্পর্কে আরেকজনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর নাম হেলেনা ডেমুথ। সুখে-দুঃখে এই মহিলা মার্কস পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি মার্কস পরিবারের সকলের দেখাশুনা করতেন। মার্কসের বাড়িতে যাঁরা

গেছেন তাঁরা সকলেই এই মহিলার প্রশংসা করেছেন। চরম দারিদ্রের মধ্যেও তিনি পরিবারের কারো প্রতি কোন অবহেলা করেন নি এবং মার্কসের পরিবার ছেড়ে চলে যান নি। পরিবারের সকলের ওপর তিনি কর্তৃত্ব করতেন। এমন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের বুঝি কোন তুলনা নেই। এলেওনোরা হেলেনাকে মহিয়সী নারী নামে অভিহিত করেছেন।

এঙ্গেলস ছিলেন মার্কসের যথার্থ বন্ধু। মার্কসের সঙ্গে বহু প্রবন্ধ তিনি একসঙ্গে রচনা করেছেন। মার্কসের দুঃখ ও শোকের দিনে সান্ত্বনা দিতেন এবং নতুন কর্মে আত্মনিয়োগের উৎসাহ দিতেন। মার্কস পরিবারকে তিনি যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার সঠিক কোন হিসেব নেই। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই এঙ্গেলস বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছেন। এঙ্গেলসের কোন সন্তান ছিল না। মার্কসের কন্যাদের তিনি আপন সন্তানের মত স্নেহ করতেন এবং নানা কাজে উৎসাহিত করতেন। মার্কসের কন্যারাও তাঁকে পিতৃতুল্য হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। বন্ধুত্বের অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু এমন বন্ধুত্ব জগতে বিরল। লেনিন যথার্থই বলেছেন—"প্রাচীন উপকথায় সৌহার্দের নানা রকম মর্মস্পর্শী বিবরণ আছে। ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েত বলতে যে তার শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন এমন দুই মণীষা ও যোদ্ধা যাঁদের সম্পর্ক মানবিক সৌহার্দের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী যে কোন পুরা কাহিনীকে ছাড়িয়ে যায়।"

## মার্কসের সাহিত্যচর্চা

মার্কসের সাহিত্যচর্চা নিয়ে দেশে বিদেশে তেমন কোন আলোচনা হয় নি। তাঁর জীবিতকালে মাত্র দুটি কবিতা ১৮৪১ সালে

Athenaum পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতা দুটির নাম 'নৈশ-প্রেম' এবং 'বেহালাবাদক'। এ ছাড়া তাঁর আর কোন সাহিত্য রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি। মার্কসের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে ১৯২৯ সালে জার্মান ভাষায় তাঁর রচিত সাহিত্যগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয় নি। ইংরেজীতে অনুবাদ হওয়ার পর মার্কসের সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা শুরু হয়। তবে এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি।

মার্কস লিখেছিলেন একটি কাব্য নাটক, একটি উপন্যাস এবং বেশ কিছু কবিতা। কাব্য নাটকটির নাম। 'অউলেম' বা উলানেম' এটি সম্পূর্ণ নয়। উপন্যাসটির নাম 'স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স' এটিও সম্পূর্ণ নয়। মার্কসের সাহিত্য চর্চার সময় খুবই কম। উল্লিখিত রচনাগুলি রচিত হয়েছিল ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৮-এর মধ্যে। চারটি খাতায় মার্কস তাঁর সাহিত্যগুলি লিখেছিলেন। তিনটি খাতায় ছিল কেবল কবিতা। এই তিনটি খাতা তিনি উৎসর্গ করেছিলেন প্রিয়তমা য়েনীকে। চতুর্থ খাতাটি উৎসর্গ করেছিলেন পিতাকে। এতেছিল কাব্য নাটক, উপন্যাস। বড় বোন সোফিয়ার অ্যালবামে এবং নোট বইয়ে কিছু কবিতা পাওয়া গেছে!

প্রিয়তমা য়েনীকে উৎসর্গ করা কবিতাগুলির অধিকাংশই সনেটের আকারে রচিত। প্রিয়তমার প্রতি আকুল ও আন্তরিক প্রেম, বিরহ বেদনা থেকে কাব্যগুলি রচিত হয়েছে। মার্কসের অনুভূতি কবিতাগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩৬ সালে মার্কস যখন উচ্চশিক্ষার জন্যে বন এবং বার্লিনে ছিলেন তখনই সাহিত্যগুলি রচিত হয়েছিল। মার্কসের সাহিত্যচর্চা ছিল ক্ষণিক। তাঁর অনেক কাব্যে দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রিয়তমা য়েনীকে উৎসর্গ করা কবিতাগুলি তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ হলো বুক অব লাভ আর তৃতীয় ভাগ হলো বুক অব সংস। উদাহরণ হিসেবে দু-তিনটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া হলো।

য়েনীর উদ্দেশ্যে লেখা সনেট

নিয়ে যাও, তুমি নিয়ে যাও আমার সমস্ত গান
তোমার কাছে নত আমার সমস্ত ভালবাসা,
যেখানে লিয়ার স্বপ্নমধুর তান
হৃদয়ের উজ্জ্বল আলোয় নিত্যকার যাওয়া আসা।

আর একটি সনেট—

য়েনী! তুমি নিপাট খুঁজে দেখতে পারো
কেন আমি আমার গানে দিয়েছি নাম য়েনীকে স্মৃতিময়,
... .... ... ...
যখন শুধু তোমারই জন্যে আমার নাড়ির স্পন্দন তীব্র ধ্বনিময়,
যখন শুধু তোমারই জন্যে আমার নৈরাশ্যের হাহাকার
যখন শুধু তুমি পারো তাদের হৃদয়ে উত্তাপের সঞ্চার,

যেন দূর হৃদয়ের কম্পন,
সোনার তার বাঁধানো সির্থানের হালকা আলাপন,
যেন বিস্মিত অস্তিত্বে আশ্চর্য জাদুময়!

আরও একটি সনেট—

দেখো! আমি হাজার কেতাব লিখে যেতে পারি,
প্রত্যেক পংক্তিতেই যেখানে শুধু য়েনী এবং য়েনী,
.. .. .. ..

আগামীদিন যাতে দেখতে পারে, সেই প্রত্যাশা
ভালোবাসা যেন য়েনী, য়েনী মানেই ভালোবাসা।

য়েনীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি কবিতার শেষের দুটি পংক্তি —

অনুভব

তাহলে এসো, আমরা পার হই নির্মম সাহসিকতায়
ঈশ্বরের সেই স্থির পূর্ব প্রান্তর,
দুঃখ এবং আনন্দের উচ্ছলতায়
ঐশ্বর্যের সংগীত বাজে নির্ঝর।

তাহলে এসো মুখোমুখি হও ঝড়ের
নয় বিশ্রাম, নয় ক্লান্তি নিয়ে,
নিরানন্দ অথবা ভয়ের,
কাজ হীন নয় অথবা আশাকে বাদ দিয়ে,
নয় শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবা
কষ্টের অথবা বেদনার পায়ে মাথা রেখে,
আমাদের ইচ্ছে, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা
নিশ্চিত জেনো অপূর্ণই রয়ে যাবে।

পিতার উদ্দেশ্যে—

সৃষ্টি

সৃষ্টিশীল আত্মা সৃষ্টির বাইরে
ভেসে যায় তরঙ্গে দূরে বহুদূরে,

পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হয়, জীবন জন্ম নেয়,
তাঁর চোখ বিস্ফারিত হয় নিঃসীমে।
শুধু ভালোবাসার কাছেই নিজেকে উন্মুক্ত করো ;

... ... ... ...

শাশ্বতের চিরন্তন আসন!
যেমন তোমাকে আমি দিয়েছি,
মুক্ত করা অন্তরের আলোক বিচ্ছুরণ।

## সাইরেন সংগীত

একটি ব্যালাড

তারই মৃদু ধ্বনি তোলে,
বাতাসের সাথে খেলা করে,
মাঝ দিয়ে শূন্যে হারায়।

.. .. .. ..

সংকেত থেমে যায়
তার তীব্র ভ্রূভঙ্গিমায়
আলোর স্তিমিত কম্পন
তারা অনুসরণ করে তাকে
সহসা বন্যার হিংস্র গ্রাসে
মুছে যায় সব দৃশ্যের অঙ্গন

## এপিগ্রাম

মূর্খ, বধির হাতওয়ালা আরাম কেদারায়
জর্মনির মানুষ থাকে অপেক্ষায়।
এখানে — ওখানে ওঠে ঝড়,
আকাশে মেঘ ঢাকে, কালো অন্ধকার।

বিদ্যুৎ ঝলকায়, সাপের মতো
অনুভবে আবিষ্ট।
কিন্তু সূর্য যখন মেঘ সরিয়ে মুখ বাড়ায়

অতীতকে নিয়ে মাতামাতি সারাবেলা ;
ভাবে এই ভাবে পৌঁছে যাবে বর্তমানে,
স্বর্গ এবং পৃথিবী এগোক নিজেদের পথ পানে ;
তারা চলে ঠিক আগের মতই আবার,
তরঙ্গ ধাক্কা খায় পাহাড়-বেলায়; উথাল-পাথার।

মার্কসের কাব্যে কিছুটা উদাসীভাব আছে। কাব্য রচনার ধরণ প্রাচীন এবং কাব্যকে ছন্দের বাঁধনে বাঁধবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রেমানুভূতির কবিতাগুলি বাদে অন্যান্য কবিতা চিত্রধর্মী। মার্কসের কবিতা গুচ্ছের মধ্যে একমাত্র প্রেমের মহৎ আদর্শ ছাড়া আর কোন মহৎ আদর্শ প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু কবিতাগুলিকে নিচ্ছক ক্ষণিকের চর্চা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে সমকালীন সমাজের দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্যই কবিতার ক্ষেত্রে মার্কস কিছুটা অন্তর্মুখীনতার পরিচয় দিয়েছেন।

কাব্যে সমাজ বোধের অন্তর্মুখীন পরিচয় থাকলেও কাব্য নাট্য অউলানেম-এ সমাজচেতনার বহির্মুখীন পরিচয় আছে। তদুপরি কাব্যনাট্যটিতে জীবনবোধের ও বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সমকালীন জার্মান সমাজের সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও বিক্ষুব্ধ মানুষের প্রতিবাদ কাব্যনাট্যটিকে তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে। কাব্যনাট্যের চরিত্রগুলি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতীক। প্রধান চরিত্র অউলানেম বলেছে—

সব কিছু ধ্বংস হলো। আমার সময় শেষ, যদিও
শাশ্বত সময় দাঁড়িয়ে আছে শুধু। ক্ষুদ্রকায় বিশ্বও

এখন স্তব্ধতায় বিসর্জিতা ! শীঘ্রই চিরন্তনকে আমি করবো আলিঙ্গন
এবং মনুষ্যত্বের দানবীয় অভিশাপ শোনাব তাকে তখন।

.. .. .. ..

আমরা, যারা দেয়াল ঘড়ির মতো এক যন্ত্র যার দুচোখ অন্ধ,
শুধুই ক্যালেণ্ডারের পাতার মতো সময়কে বয়ে নিয়ে যায়,
শুধুই ঘটে সেইটুকু যা ঘটার, আশ্চর্য রোমাঞ্চহীনতায়
এবং তারপর শেষ, নিশ্চিত ধ্বংস থাকে তারপর।

... ... ... ....

নিশ্চিতের কাছে অসহায় সমর্পণ
অভিশাপের মূর্ত অঙ্গীকার ! তবে বিষাক্ত দৃষ্টি তখন
আনুক ধ্বংস, অন্ধ পৃথিবীতে আসুক রোমাঞ্চের শিহরণ !
আর আমরা, বন্দী চিরকাল, ছিন্নভিন্ন, নিমজ্জিত শূন্যতায়
বন্দী পাথরের প্রতিটি মিনারে
বন্দী, বন্দী, অনন্ত সময়ের পাখায় !

অউলানেম কাব্য নাট্যের ওপর গ্যেটের ফাউস্ট ও শেলির প্রমিথিউসের প্রভাব আছে। ১৮৩৭-এ এই কাব্য যার সূচনা তাই ১৮৪৮-এ কমিউনিস্ট ইসতেহারে পরিণতি লাভ করেছে। মার্কসের অন্তরে বিশ্ববীক্ষার যে চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে অউলানেমের দীর্ঘবক্তৃতায় তারই চূড়ান্ত রূপ ধ্বনিত হয়েছে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে। পেইন ঠিকই বলেছেন—"Long Speech of oulanem consigning the world of damnation and annihilation offer & clue to the real nature of the conflict he resolved is the communist Manifesto."

স্করপিয়্যান ও ফেলিক্স উপন্যাসে সমাজচেতনার ঔজ্জ্বল্য ও

ব্যঙ্গের তীব্রতা হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। নাড়া দিয়ে যাওয়াই মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। মার্কসের একমাত্র অসম্পূর্ণ উপন্যাসে মহৎ আদর্শের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়! শেষ তিনটি লাইন উদ্ধৃত করলেই উপন্যাসটির প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়বে—

"হায়রে দুর্ভাগা বোনিফাসে! তোমার সমস্ত উজ্জ্বল চিন্তাধারাই আবদ্ধ হয়ে রইল, অপ্রকাশিত রয়ে গেল, কারণ তুমি আর কোন দিনই তা বলতে অথবা লিখতে পারবে না।

হে গভীরতার আশ্রয়স্থল! হে ধর্মীয় আবদ্ধতা।"

(সমস্ত অনুবাদগুলি পপুলার লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত রথীন চক্রবর্তী অনুদিত কার্ল মার্কসের সাহিত্য সমগ্র থেকে গৃহীত!)

মার্কসের সাহিত্য সম্পর্কে যাঁরা অবহেলা এবং অবজ্ঞা করেন তাঁরা যথার্থ সাহিত্য বোদ্ধা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। মার্কসের সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলে তাঁর পরবর্তী দর্শন চিন্তার এবং সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার বিষয় সম্পর্কিত রচিত গ্রন্থগুলি বুঝতে সুবিধে হবে।

## সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবে জীবন শুরু

১৮৪২ সাল থেকে মার্কস পাকাপাকি ভাবে লেখা শুরু করেন। তাঁর প্রথম রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ প্রাশিয়ার সেন্সর ব্যবহার বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক রচনা। প্রবন্ধটির নাম 'প্রাশিয়ার নবতম সেন্সর নির্দেশ প্রসঙ্গে। এ প্রবন্ধটি জার্মানিতে প্রকাশিত হয় নি। এটি প্রকাশ পায় সুইজারল্যাণ্ড থেকে আর্নল্ডরুগের আনেকডোটা পত্রিকায় ১৮৪৩ সালে। ১৮৪২ সালে জার্মানির রাইনিশে সাইতুং পত্রিকায় এপ্রিল মাসে সহকারী হিসেবে যোগ-দেন এবং নিয়মিতভাবে লিখতে শুরু করেন। ঐ বছরই অক্টোবর মাসে তিনি পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্পাদক হিসেবে এবং অপূর্ব সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে তিনি পত্রিকাটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং পত্রিকাটিকে একটি বিপ্লবী চরিত্রের রূপ দেন। সে সময়ে প্রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল। মার্কস প্রথম থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং মেহনতী মানুষ ও সংগ্রামী মানুষের সপক্ষে লেখনী শুরু করেন। এই পত্রিকায় কাজ করবার সময় মার্কস বৃহত্তর জনসমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন। শুধু জার্মান নয়, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মেহনতী মানুষের অবস্থা এবং তাদের সংগ্রাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও যোগ স্থাপন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়ন ও তার সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন প্রভৃতি বিষয় বৃহৎ তাৎপর্যমণ্ডিত। এসবই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিতবহ। লেনিনের

কথায়—"এখানে সূচিত হয়েছে ভাববাদ থেকে বস্তুবাদে, বিপ্লবী গণতন্ত্রবাদ থেকে কমিউনিজমে মার্কসের উত্তরণ।"

রাইনিশে সাইতুং পত্রিকায় প্রথম লেখেন সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে প্রবন্ধ। জনগণের কণ্ঠরোধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মার্কস তীব্র ভাষায় জার্মান সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি দেখান সংবাদপত্র জনগণের মানস দর্পণ। জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় সংবাদপত্রে। তাছাড়া তিনি সংবাদপত্রকে লাভজনক ব্যবসার উপায় হিসেবে দেখার বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেন। কায়েমী স্বার্থের পরিপোষক লেখকদের বিরুদ্ধেও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন "অস্তিত্ব রক্ষা ও লেখা যাতে সম্ভব হয় তার জন্যে লেখাকে অবশ্যই রোজগার করতে হবে, কিন্তু রোজগারের জন্যে অস্তিত্বরক্ষা ও লেখা কোনক্রমেই তাঁর উচিৎ নয়।"

সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে তিনি শাসক শ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেন। 'রাইনের ষষ্ঠ প্রতিনিধিসভার তর্কবিতর্ক' মোসেলের সংবাদদাতার সপক্ষে প্রভৃতি প্রবন্ধ জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে! বন সম্পদের মালিকদের বিরুদ্ধে এবং গরীব চাষীদের পক্ষে তিনি শাণিত বাক্যবান নিক্ষেপ করেন। তিনি বন সম্পদের মালিকদের অমানুষিক অত্যাচারের দিক তুলে ধরেন। মেহনতী মানুষের পক্ষ নিয়ে তিনি তাদের অভাব, দারিদ্র, শোষণ, প্রভৃতির সম্পর্কে তথ্য সহকারে মত ব্যক্ত করেন। এই সময় থেকেই তিনি মেহনতী মানুষের বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বুঝতে পারেন রাজনৈতিক অর্থনীতি তাঁরা পড়া নেই! সে জন্যে তিনি এ বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে রাষ্ট্রের প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন লেখনীর মাধ্যমে। এ-বিষয়ে এঙ্গেলস বলেছেন—যে বন সম্পদ "অপহরণ

সংক্রান্ত আইন এবং মোসেলের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনাই তাঁকে বিশুদ্ধ রাজনীতি থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক চর্চায়, আর এইভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণে উদ্বুদ্ধ করে।"

রাইনিশে সাইতুং পত্রিকায় কাজ করার সময় মার্কসের সঙ্গে বাউয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং তরুণ হেগেলপন্থীদের সঙ্গে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। তিনি এদের লেখা ছাপতে অস্বীকার করেন। অনেক বাধা তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। সব বাধা সরিয়ে তিনি সাহসের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। রাইনিশে সাইতুং পত্রিকার নির্ভীক সংবাদ প্রচার ও প্রবন্ধ দেখে প্রাশিয়া সরকার ভীত হয়ে পড়ে। ১৮৪৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যাপার আগেই বুঝতে পেরে মার্কস ১৭ই মার্চ সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন।

এরপর মার্কস রুগের সঙ্গে একত্রে সংবাদ পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করতে থাকেন। দুজনের মধ্যে চিঠি পত্রের আদানপ্রদান চলতে থাকে। মার্কস লেখেন পত্রিকার কাজ হবে প্রচলিত সব কিছুর নির্মমসমালোচনা। ঠিক হয় পত্রিকা প্রকাশ করা হবে প্যারিস থেকে। ১৮৪৩ সালের অক্টোবরে মার্কস সস্ত্রীক প্যারিসে আসেন। নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৪-এর ফেব্রুয়ারীতে। পত্রিকার নাম হয় জার্মান ফরাসী বার্ষিকী।

এর আগে মার্কস একটি বড় প্রবন্ধ রচনা করেন ক্রয়েৎসনাখ—এ। প্রবন্ধটির নাম বোল হেগেলীয় অধিকার দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে (ক্রিটিক অব দি হেগেলিয়ান ফিলসফি অব রাইট)। প্রবন্ধের বিষয় হলো রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা। হেগেলের রাষ্ট্র ও অধিকার সম্পর্কিত ভাববাদী চিন্তার বিরুদ্ধে লুডভিগ ফয়েরবাখ প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়টি

মার্কসকে বস্তুবাদী দর্শনে আসতে অনেকটা সাহায্য করে। ফয়েরবাখ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বস্তুবাদী বিশ্লেষণ করেন কিন্তু অন্যান্য বিষয় যেমন ইতিহাস, সামাজিক সম্পর্ক, রাজনীতি প্রভৃতি ব্যাপারের বিশ্লেষণে ফয়েরবাস ভাববাদকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। মার্কস বাদের যাদের সীমাবদ্ধ করে তার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবীটা গড়ে তোলেন। হেগেলি বলেছেন নাগরিক সমাজ রাষ্ট্রের দ্বারা নির্ধারিত হয়। মার্কস বলেছেন রাষ্ট্র ও নির্ধারিত হয় নাগরিক সমাজের দ্বারা। রাষ্ট্র যে শ্রেণী প্রভুত্বের হাতিয়ার সেকথা মার্কসই প্রথম ঘোষণা করেন।

প্যারিসে এসে মার্কস ফ্রান্সের অতীতবিপ্লব সম্পর্কে নতুনভাবে জ্ঞান লাভ করেন। ফ্রান্সের সমকালীম জন জীবন, শাসক সম্প্রদায়ের স্বরূপ ভালভাবে অনুধাবন করেন। ফ্রান্সে তখনো বিপ্লবের স্মৃতি মুছে যায় নি। বিপ্লবীদের গোপন সভাসমিতি নতুন করে স্থাপিত হয়। দেশান্তরী জার্মান শ্রমিকরা গঠন করে ন্যায়নিষ্ঠ লীগ। মার্কস প্রতিটি সংগঠসের নেতাদের সঙ্গে যোগযোগ করেন। ফরাসী কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী দলের লুইব্রাঁ। নতিয়েন বলবে পিয়েরলেরু এবং রাশিয়ার রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বাকুনিন, বোতকিন প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

১৮৪৪ সালের 'জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী' পত্রিকায় মার্কস লেখেন 'ইহুদী প্রশ্ন' প্রবন্ধ। তিনি হেগেল-পন্থী ব্রুনো বাউয়েরের সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক নির্যাতন থেকে মানুষের মুক্তির পথ এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূলগত সত্যের উদ্‌ঘাটনে প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ। হেগেলের অধিকার দর্শনের আলোচনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁর আলোচনা করেছেন এ কটি বিউশন টুদি ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি-'র মুখবন্ধে। ধর্মের বিরুদ্ধে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন! এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যেই

ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। প্রগতিশীল দর্শনের কাজ হলো ধর্মবিরোধী সংগ্রামকে সমর্থন করা, পরজাগতিক সমালোচনাকে ইহজাগতিক সমালোচনায় এবং ঈশ্বরবাদের সমালোচনাকে রাজনীতির সমালোচনায় পরিণত করা। এই আলোচনা হবে বিপ্লবের সহায়ক। দর্শন যেমন প্রলেতারিয়েতের মধ্যে তার বৈষয়িক অস্ত্রকে খুঁজে পায়, ঠিক তেমনি-ভাবে প্রলেতারিয়েতেও দর্শনের মধ্যে খুঁজে পায় তার আত্মিক অস্ত্র।

এই সময় মার্কস বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের প্রবক্তাদের রচনা অধ্যয়ন করেন এবং তাঁদের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করে লেখেন 'ইকনমিক্ এ্যাণ্ড ফিলসফিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্ট'। প্যারিসে এসেই মার্কস সর্বহারার মহান বিপ্লবের তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অগ্রসর হন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো প্যারিসেই সাক্ষাৎ হয় এঙ্গেলসের সঙ্গে। এই সাক্ষাৎ দুজনকে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুজনেই একই পথের পথিক, একই চিন্তার শরিক। এই অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন সারা পৃথিবীতে দুর্লভ।

জার্মান ফরাসী বার্ষিকী পত্রিকার যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় প্রধানত দুটি কারণে। প্রথম কারণ আর্থিক সংকট। প্রথম থেকেই পত্রিকাটি আর্থিক সংকটে ভুগছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার অধিকাংশ কপি প্রাশিয়ার সীমান্তে বাজেয়াপ্ত করা হয়। এতে আর্থিক সংকট আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সব থেকে বড় কারণ সম্পাদকীয় বোর্ডের সঙ্গে মার্কসের মত বিরোধ। এই বিরোধ প্রথম থেকেই ছিল। বিরোধ বেড়ে যায় জার্মানির সাইলেসিয়ার বয়নশিল্পের কর্মীদের অভ্যুত্থানের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার রুগ ছিলেন বুর্জোয়া সংস্কার-পন্থী। সাইলেসিয়ার বয়নশিল্পের কর্মীদের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে মার্কস ও রুগের মধ্যে মসিযুদ্ধ শুরু হয় প্যারিস থেকে প্রকাশিত জার্মান ভাষায় ফরওয়ার্ড পত্রিকায়। এই অভ্যুত্থানকে রুগ বলেন অন্ধের মত অর্থহীন বিদ্রোহ। কিন্তু মার্কস এই বিদ্রোহকে স্বাগত

জানান জার্মানিতে প্রথম সর্বহারাদের বিদ্রোহ বলে। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান এই বিদ্রোহের মধ্যে আছে কর্মতৎপরতা এবং শ্রেণী চেতনা এই মসিযুদ্ধ থেকে রুগের সঙ্গে মার্কসের চির বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মার্কস ক্রমেই ফরওয়ার্ড পত্রিকার প্রতি মনযোগী হন। মার্কসের প্রভাবে পত্রিকাটি কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হতে থাকে এবং প্রাশিয়ার সরকার বিরোধী হয়ে ওঠে।

প্রাশিয়া সরকারের চাপে ফরাসী সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয় এবং মার্কসকে ফ্রান্স থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়। ১৮৪৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী মার্কস প্যারিস থেকে ব্রাসেলসে চলে যান। প্যারিসে থাকাকালে মার্কস ও এঙ্গেলস যৌথভাবে লেখেন 'দি হোলি ফ্যামিলি (পবিত্র পরিবার) অব দি ক্রিটিক্যালক্রিটিক এগেনেস্ট ব্রুনো বাউয়ের এ্যণ্ড কোং'। গ্রন্থটির অধিকাংশই মার্কসের লেখা। রাইনিশে সাইতুং পত্রিকায় কাজ করার সময় হেগেলপন্থী ব্রুনো বাউয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছিল দর্শনের তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে। এই গ্রন্থে হেগেলের ভাববাদী দর্শনের প্রবক্তা ব্রুনো বাউয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ও তাদের সঙ্গীদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়।

হেগেলপন্থী ব্রুনো বাউয়েররা বিশ্বাস করতেন ইতিহাস সৃষ্টি করে একমাত্র বাছাই করা ব্যক্তিরা। এই আত্মমুখী ভাববাদী চিন্তাধারার সমালোচনা করে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখালেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সূত্র। ব্যক্তি নয় জনসাধারণই সৃষ্টি করে ইতিহাস। যতই দিন এগিয়ে যাবে ততই জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে হয়ে উঠবে সচেতন ও সক্রিয়। উভয়ে প্রকাশ করেন বিশ্ব ইতিহাসে সর্বহারাদের ভূমিকাই প্রধান। ইউরোপীয় (যাঁরা কল্পনার স্বর্গে বাস করেন) সমাজতন্ত্রীরা দেখেছেন সর্বহারারা অসহায় যন্ত্রণা-কাতর নিপীড়িত মানুষ মাত্র। এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে মার্কস ও এঙ্গেলস দেখালেন সর্বহারাদের মধ্যে এমন শক্তি নিহিত আছে যার

দ্বারা তারাই পারবে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে। পুঁজিবাদী সমাজে তারা যে অবস্থার মধ্যে থাকে তারই মধ্যে নিহিত আছে বৈপ্লবিক শক্তি। এঁদের চিন্তার বিকাশে প্রতিফলিত হয় বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে সর্বহারাদের দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে এই চিন্তার ভিত্তির ওপর স্থাপিত হবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের ইমারত। এই ধরনের বৈপ্লবিক চিন্তা সমাজতন্ত্রের কল্পনাকে নিয়ে আসে বাস্তবের কঠিন পথে। সমাজতন্ত্রের চিন্তা আর কল্পনা নয়, তা বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হলো। এ-বিষয়ে লেনিন বলেছেন—"সমাজ তান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্যে প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে দেখানই হলো মার্কসীয় মতবাদের প্রধান কথা।"

১৮৪৫ সালে মার্কস তাঁর নোটবুকে 'ফয়েরবাখ সম্পর্কিত থিসিস-সমূহ'-এর খসড়া করেন। ফয়েরবাখ সম্পর্কিত আলোচনায় মার্কস দেখান পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপান্তর সাধনে বিপ্লবী প্রয়োগের ভূমিকা। ফয়েরবাখ বস্তুবাদের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলেছেন। বিপ্লবী কার্য-কলাপ সম্পর্কে তিনি কোন কথা বলেন নি। সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন নি। মানুষকে তিনি দেখেছেন সমাজ ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে। মার্কস ফয়েরবাখের তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন। মার্কস মানুষকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানুষই সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের অঙ্গীভূত। ফয়েরবাখ ও অন্যান্য দার্শনিকদের সঙ্গে নিজের তত্ত্বের মূলনীতি সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করেছেন—"দার্শনিকরা শুধু ভিন্ন ভিন্ন রূপে জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই যে তাকে পরিবর্তন করতে হবে।"

মার্কস ও এঙ্গেলস যুক্তভাবে আর একটি বই লেখেন। বইটির নাম জার্মান আইডিওলজি বা জার্মান ভাবাদর্শ। বইটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। বইটির কাজ শেষ হয় ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে। বইটিতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারাসমূহ সূত্রাকারে বিবৃত করা হয়।

বইটির উদ্দেশ্য ফয়েররাখ, বাউয়ের, স্টিরনার প্রভৃতি জার্মান দার্শনিদের মতবাদকে খণ্ডন করা এবং তথাকথিত প্রকৃত সমাজতন্ত্রের ধারণার বিরোধিতা করা। সমাজ বিকাশের প্রচলিত মতবাদের ক্ষেত্রে মার্কসের আবিষ্কার বিপ্লব নিয়ে আসে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ইতিহাস পরিণত হয় খাঁটি বিজ্ঞানে। সমাজ বিকাশের এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্বাচিত হয় উৎপাদন পদ্ধতির ওপর। ধর্ম-দর্শন এবং চেতনা এর সঙ্গে জড়িত। দুজনে দেখিয়েছেন "চৈতন্য জীবনকে নির্ধারণ করে না। জীবনই নির্ধারণ করে চৈতন্যকে।" বইটিতে তারা সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোগুলি সম্পর্কে নিজেদের শিক্ষা লিপিবদ্ধ করেন। ঐতিহাসিক নীতির সঙ্গে মানব সমাজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই নীতির সঙ্গে যুক্ত উৎপাদন সম্পর্ক। এর বিকাশ হয় দ্বান্দ্বিক নিয়মে। এঁরা প্রমাণ করেন সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আর এই ধনতন্ত্রকে অপসারিত করবে সমাজতন্ত্র। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্যে প্রয়োজন সর্বহারাদের শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি এই বইটিতেই নিহিত আছে। সাম্যবাদী সমাজ তাঁদের কাছে স্বপ্নের বিকার ছিল না। সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বৈপ্লবিক প্রয়োগকর্মের দ্বারা। তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সংযোগ সাধন করতে হবে। ইতিহাসকে বদল করতে হবে। আর এ কাজ পারে একমাত্র সর্বহারা-শ্রেণী। আগের দার্শনিকরা নানাভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম ইতিহাস বদলের প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। সাম্যবাদের ভিত্তিভূমি হবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এ-বিষয়ে লেনিন বলেছেন—"ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হয়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞান চিন্তার মহত্তম কীর্তি।"

১৮৪৫ সালে ব্রাসেলসে এঙ্গেলসের সঙ্গে মার্কসের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছেন—"১৮৪৫ সালের বসন্ত-কালে ব্রাসেলসে যখন আমাদের আবার দেখা হলো মার্কস তখনই

প্রধান প্রধান রূপরেখায় ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বস্তুবাদী তত্ত্বের বিকাশ সম্পন্ন করেন এবং আমরা বহু বিচিত্র দিকে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বিশদ চর্চায় প্রবৃত্ত হই।" ১৮৪৫ সালের ১২ই জুলাই থেকে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত দুইবন্ধু ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রথম পুঁজিবাদের দেশ এবং তার শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ। ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরে তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ও তাদের আন্দোলনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। চার্টিস্ট আন্দোলনের বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এঁদের সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠ লীগের নেতাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। চার্টিস্ট আন্দেলনের বামপন্থী নেতাদের ও দেশান্তরী বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মিলে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনায় মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। তাঁরা ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসার পর যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস যোগাযোগ রেখে প্রতিষ্ঠানটিকে বিপ্লবী চরিত্র দিতে চেষ্টা করেন।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে যৌথভাবে রচনা করেন জার্মান ভাবাদর্শ বা জার্মান আইডিওলজি যার কথা আগেই বলেছি। এই পর্বে মার্কস বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করেন।

## সর্বহারার মহান সংগ্রামী মার্কস

মার্কস ও এঙ্গেলস নিজেদের বৈপ্লবিক মতবাদকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে ব্যবহারের জন্যে উদ্যোগী হন। সমাজ-তন্ত্রকে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের তত্ত্ব দিয়ে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং ধনতন্ত্রের বিনাশ করে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে উভয়ে ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই ব্রাসেলসে ১৮৪৬ সালে সমমতাবলম্বীদের একটি দল গড়ে উঠল যার নাম কমিউনিস্ট করোসপনডেন্স কমিটি। সংগ্রামের এটি প্রথম পদক্ষেপ।

এই কমিটিতে ছিলেন ভিলহেলম ভোল্‌ফ, এডগার ভেস্টফালেন, ফার্ডিনান্দ ভোলফ, জোসেফ ওয়েডেমার, সেবাস্টিয়ান, জেইলার, গেওর্গ ভিয়ের্থ এবং বেলজিয়ামের বিপ্লবী কর্মী ফিলিপজিগো, ভিক্তর তেদেস্কো ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। কমিটির কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে যোগাযোগ ও ঐক্য স্থাপন, কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা। মত বিনিময় ও ভ্রান্ত ধারণার সমালোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে এক বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী গ্রহণ করা। ১৮৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে ব্রাসেলস কমিউনিস্ট করোসপনডেন্স কমিটি ইংলণ্ডের চার্টিস্টদের সঙ্গে, লণ্ডনের ন্যায়নিষ্ঠ লীগের সঙ্গে, প্যারিসের ন্যায়নিষ্ঠ লীগের সঙ্গে, জার্মানির কলোন—এলবারফেল্ড, ভেস্টফালিয়া, সাইলেসিয়া এবং অন্যান্য স্থানের বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। আর মার্কসের বাড়ি হয়ে ওঠে এর সদরদপ্তর।

সে সময়ের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী মতবাদের প্রতিনিধি ছিলেন ভিলহেলম ভেটলিং। ভেটলিং ব্রাসেলসে এলে তাঁকে বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণের চেষ্টা করেন দুই বন্ধু। কিন্তু ভেটলিং তাঁর নিজস্ব মতবাদ ত্যাগ করেন না। ভেটলিং বিপ্লবের প্রয়োজনীতা স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন বিপ্লবের চালিকা শক্তি হবে লুম্পেন প্রলেতারিয়েত। মার্কস ও এঙ্গেলস তথাকথিত সাম্যবাদের এবং সঠিক সমাজবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। সঠিক সমাজবাদের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরা হয়। সঠিক সমাজবাদ সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যের সংঘর্ষকে মোলায়েম করবার চেষ্টা করতো মিথ্যে বুলি দিয়ে। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রুধোঁর ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। প্রুধোঁর লেখা দারিদ্রের দর্শন-এর বিরুদ্ধে মার্কস লেখেন দর্শনের দারিদ্র। বুর্জোয়া অর্থনীতি-ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজ তার অর্থনীতির নিয়ম ও গতিবিধির এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির ভ্রান্তিগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বুর্জোয়াদের দ্বারা নতুন উৎপাদন শক্তি অর্জন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। এর ফলে সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন হাতে চালান সূতাকল সামন্ত সমাজের সূচনা করে এবং বাষ্পচালিত সূতাকল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সূচনা করে। "যে সমস্ত লোক তাদের বৈষয়িক উৎপাদনের বিকাশ অনুযায়ী সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তারাই নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক অনুযায়ী মূলনীতি, ধ্যান-ধারণা এবং শ্রেণীবিভাগও গড়ে তোলে।

এইভাবে, এইসব ধ্যান-ধারণা, এইসব শ্রেণী বিভাগ ততটাই স্বল্প স্থায়ী, যতটা স্বল্পস্থায়ী তাদের দ্বারা প্রকটিত সম্পর্ক। ঐতিহাসিক ও অচিরস্থায়ী ফল রূপে এদের পরিচয়।" মার্কস দেখিয়েছেন বুর্জোয়া সমাজের স্বভাব সিদ্ধ বিরোধ এবং এই বিরোধের সৃষ্টি হয় কি ভাবে। শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বিরোধ এবং এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে কিভাবে এবং এর ফলে ধনতন্ত্রবাদ বাধ্য হয় উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার

জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে। এই বইয়ে শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কিত ব্যাপারে সর্বহারাদের রণকৌশলের ভিত্তি রচিত হয়। 'দর্শনের দারিদ্র' বইটিতে দর্শনশাস্ত্র, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র, সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবী তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে। লেনিন বলেছেন—মার্কসের পরম কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রথম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে এক অবিচ্ছেদ্য সামগ্রিকতায় সংযুক্ত করেছেন। ১৮৪৭ সালে ব্রাসেলসের শ্রমিকদের কাছে মার্কস যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলি মজুরি-শ্রম ও পুঁজি নাম দিয়ে ১৮৪৯ সালে নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতেও তিনি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত করেছেন।

১৮৪৭ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস ন্যায়নিষ্ঠ লীগের সদস্য হন। আর্থিক অনটনের জন্যে মার্কস লণ্ডনে অনুষ্ঠিত লীগের কংগ্রেসে যোগদান করতে পারেন নি। যাইহোক প্রথম কংগ্রেসের পর মার্কসের মতবাদ ব্যাপকতা লাভ করে। ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে ব্রাসেলসে কমিউনিস্ট লীগের গোষ্ঠী সংগঠিত হয় এবং অঞ্চল কমিটিও গঠিত হয়। উভয় সংস্থার নেতৃত্বে থাকেন স্বয়ং মার্কস। কমিউনিস্ট লীগের কাজ ছাড়া ব্রাসেলসে ডেমোক্রাটিক এসোসিয়েশন গঠন করতে মার্কস ও এঙ্গেলস সক্রিয় ভূমিকা নেন। এই সংগঠনের লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে মিলিত করা।

কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতির ওপর মার্কস ও এঙ্গেলস গুরুত্ব আরোপ করেন। এই কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলসের উত্থাপিত নীতিগুলি গৃহীত হয় এবং তাঁদের ওপর ইস্তাহার রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৪৭ সালে ডয়েশ ব্রুসেলার সাইতুং পত্রিকার সঙ্গে দুই বন্ধু যুক্ত হন এবং পত্রিকাটির চরিত্র পাল্টে দেন। শেষ পর্যন্ত পত্রিকাটি কমিউনিস্ট লীগের মুখপত্র হয়ে ওঠে। পত্রিকাটিতে মার্কস ও এঙ্গেলস অনেক প্রবন্ধ লেখেন। এইসব প্রবন্ধে প্রাশিয়া সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয় এবং আসন্ন বিপ্লবে সর্বহারাদের রণনীতি ও রণকৌশলের কথা ঘোষণা করা হয়। এই সময় পেটি

বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী কার্ল হাইনৎসেনের বিরুদ্ধে মার্কস রচনা করেন 'নীতিমূলক সমালোচনা ও সমালোচনা মূলক নীতি' প্রবন্ধ। কমিউ-নিজমকে লক্ষ্য করে হাইনৎসেন যেসব আজগুবি কথা বলেছিলেন মার্কস নির্মমভাবে তার মুখোশ খুলে দেন। মার্কস ব্যাখ্যা করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান ধারা, অর্থনৈতিক বনিয়াদ, রাজনৈতিক কাঠামোর ভূমিকা, সমাজের শ্রেণী কাঠামো, রাজতন্ত্রের চরিত্র, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য ও কর্তব্য। তিনি জানতেন জার্মানিতে আসন্ন বিপ্লব হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। তবু এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন—"তারা বুর্জোয়া বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং করা তাদের উচিতও হবে, যেহেতু তা হল শ্রমিক বিপ্লবের পূর্বশর্ত। তবে শ্রমিকরা যেন মুহূর্তের জন্যেও বুর্জোয়া বিপ্লবকে তাদের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচনা না করে।"

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আসন্ন বিপ্লবে মার্কসের মতবাদ গৃহীত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস বিপ্লবী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে সচেষ্ট হন।

সংগ্রামী মার্কসের অমর বই কমিউনিস্ট ম্যানিফ্যাস্টো বা কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার। ১৮৪৮ সালে বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। কমিউনিজিমের বিজ্ঞান ভিত্তিক দলিল হলো কমিউনিস্ট ম্যানিফ্যাস্টো। যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে দর্শন, রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্র ও কমিউনিজিম এই তিনটি পরস্পর যুক্ত অংশের বিবরণ বইটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বইটির মূলকথা-সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রবাদের পতন হবে এবং গড়ে উঠবে নতুন শ্রেণীহীন সমাজ। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বা আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তার ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। "স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ড কর্তা ও কারিগর, এক কথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী

সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে কখনো আড়ালে কখনো বা প্রকাশ্যে ; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংসপ্রাপ্তিতে।”

বইটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম—বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম—প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্টরা, তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম—সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট সাহিত্য। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। উক্ত উদ্ধৃতি দিয়েই প্রথম পরিচ্ছেদের সূত্রপাত। এই পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে পুঁজিবাদী সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ, পুঁজিবাদী সমাজের চরিত্র, এবং এই সমাজের মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী সমাজ এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করবে যার ফলে শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং সেই শ্রেণী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে সর্বহারা শ্রেণী। বিকাশের এক নির্দিষ্ট ধাপে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম বিপ্লবের আকার নেবে তার ফলে বুর্জোয়া সমাজের পতন ঘটবে এবং সর্বহারা শ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে। এর পর জন্ম নেবে শ্রেণীহীন সমাজ। পরিচ্ছেদের শেষে বলা হয়েছে—“সুতরাং যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে ও উৎপন্ন-দ্রব্য দখল করে বৃহদায়তন শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাকেই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী সৃষ্টি করেছে সর্বোপরি তারই সমাধি-খনকদের। বুর্জোয়াদের পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুই সমান অনিবার্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে প্রলেতারীর পার্টি প্রতিষ্ঠার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা, পার্টির ভূমিকা-উদ্দেশ্য-কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা। কমিউ-নিস্ট সমাজেই নিপীড়ন আর অত্যাচার থাকবে না এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হবে। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজীবাদীরা ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী সকল সুবিধে ভোগের অধিকারী শ্রেণীহীন সমাজে মেহনতী

মানুষ পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাবে এবং তাদের জীবনে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। প্রলেতারিয়েতদের যেমন আন্তর্জাতিকতা বাদে বিশ্বাসী হতে হবে তেমনি দেশপ্রেমী হতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার সমন্বয় ঘটাতে হবে। পরিচ্ছেদের সমাপ্তি ঘটেছে এই বলে—"শ্রেণী ও শ্রেণী বিরোধ সংবলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের প্রলেতারীয় নয় এমন সব মতবাদ যা সমাজতন্ত্রের পতাকা তলে সমবেত হোত তার সমালোচনা করা হয়েছে। এইসব মতবাদের ভ্রান্তি ও ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য দল এবং অন্যান্য তথাকথিত সমাজতন্ত্রদের সঙ্গে কমিউ-নিস্টদের পার্থক্য কোথায় তা তুলে ধরা হয়েছে। পরিচ্ছেদের শেষদিকে কমিউনিস্টদের কর্মকৌশলের তাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক কমিউনিজিমের মূল নিয়মগুলি সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে। পরিচ্ছেদের উপসংহার করা হয়েছে এই ভাবে— "...কমিউনিস্টরা সর্বত্রই বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করে।

এই সব আন্দোলনেই তারা প্রত্যেকটির প্রধান প্রশ্ন হিসাবে সামনে এনে ধরে মালিকানার প্রশ্ন, তার বিকাশের মাত্রা তখন যাই থাক না কেন। শেষকথা, সকলদেশের গণতন্ত্রী পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য ও বোঝাপড়ার জন্য তারা সর্বত্র কাজ করে।

আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিস্টরা ঘৃণা বোধ করে। খোলাখুলি তারা ঘোষণা করে যে, তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে কেবল সমস্ত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সবল উচ্ছেদ মারফত। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ। দুনিয়ার মজুর এক হও।"

এই বইটি সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির দিশারী। লেনিন বলেছেন—"...প্রতিভাদীপ্ত স্বচ্ছতা ও ভাস্বরতায় এ রচনায় রেখাঙ্কিত হয়েছে নতুন বিশ্ববোধ, সুসঙ্গত বস্তুবাদ, যা সমাজ জীবনেও প্রসারিত, রেখাঙ্কিত হয়েছে বিকাশের অতি সর্বাঙ্গীন ও সুগভীর মতবাদ স্বরূপ দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব।"

কমিউনিস্ট ম্যানিফ্যাস্টো প্রকাশের পরই ফ্রান্সে দেখা দিল ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সূচনা। এই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শোনা যায়। বেলজিয়াম সরকার ভয়ে মার্কসকে দেশ ছাড়া করে। মার্কস ফ্রান্সের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগ দিতে প্যারিসে যান। প্যারিসে গিয়ে তিনি লণ্ডন ও ব্রাসেলস কমিটির নির্দেশে কমিউনিস্ট লীগকে পুনর্গঠন করেন এবং তাঁকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন। মার্কস, এঙ্গেলস, বয়ার, মল, স্থাপার, ভোলফ প্রভৃতি। এই সময় এক জার্মান কবি জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে প্রেরণ করলে মার্কস তাতে আপত্তি জানান এবং বলেন জার্মান বাহিনী দেশে ফিরে গিয়ে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্যে জনসাধারণের ব্যাপক অংশকে সংগঠিত করুক। মার্কস বিপ্লব আমদানি রপ্তানির বিরুদ্ধে ছিলেন। এই ধরনের মনোভাবকে তিনি হঠকারী বলে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করেন নি।

১৮৪৮এর ১৩ই মার্চ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। ১৮ই মার্চ প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনেও বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। ইতালিতেও বিপ্লবের তরঙ্গ আছড়ে পড়ে। ফরাসী জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এবং তার জয়ে তিনি আনন্দিত হলেন। জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হলে মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মানিতে কমিউনিস্ট পার্টির দাবি শীর্ষক এক দলিলের খসড়া তৈরি করেন। ১৮৪৮ সালের এপ্রিলে দুই বন্ধু জার্মানি যান। সেখানে তখন বিপ্লব চলছিল। তাঁরা রাইন প্রদেশের কোলোন শহরে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। মার্কস ঠিক

করেন এক বৈপ্লবিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত হলো নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকা। কিন্তু জার্মানিতে শ্রমিক সংগঠন তখন ছিল খুবই দুর্বল। তখন সেখানে সবেমাত্র শিল্প গড়ে উঠছে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের নিয়ে শ্রমিকদের পার্টি তৈরি করার পরিবেশ ছিল না। সেই জন্য মার্কস স্থির করলেন পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে একটি সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজ করতে হবে এবং পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের দোদুল্যমানতার ও নানাবিধ ভ্রান্তির সমালোচনা করে যেতে হবে। কমিউনিস্টদেরই গণতন্ত্রী শিবিরে লড়াকু হিসেবে থাকতে হবে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূল বিপ্লবের একটা প্রয়োজনীয় স্তর কিন্তু শেষ স্তর নয়। মার্কস নিজে গণতান্ত্রিক সোসাইটির সভ্য এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সোসাইটির সভ্য হতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলেন শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষার দিকে, সর্বহারার পার্টি গঠন করার দিকে নজর দিতে হবে।

১৮৪৮ সালের ১লা জুন নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় গণতন্ত্রের মুখপত্র উপশিরোনামে। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন মার্কস। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন—বিউর্গেস, ড্রোনকে, এঙ্গেলস ভোল্‌ফ, ভিয়ের্থ, ভিলহেলম ভোল্‌ফ প্রভৃতি। পত্রিকাটির মাধ্যমে সমগ্র দেশময় ছড়ানো কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের কাছে নানা নির্দেশ যেতে থাকে। জার্মানির বাইরেও পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী মানুষ পত্রিকাটির দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হতে থাকেন। পত্রিকাটি জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলো প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে। সংগ্রামের রূপ নির্ধারণ ও সংগ্রামীদের কর্তব্য পত্রিকাটিতে প্রকাশ পেতে থাকে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চূড়ান্ত করার জন্যে মার্কস জনসাধারণকে ডাক দিলেন তিনি আহ্বান জানান জনগণের বিপ্লবী একনায়কত্বের শ্লোগান। কেবল শত্রুকে পরাস্ত করলেই চলবে না। বিপ্লবের সাফল্য রক্ষা করতে হবে

এবং তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। "বিপ্লবের পর প্রতিটি সাময়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য দরকার হয় একনায়কত্বের, অধিকন্তু উদ্যমশীল একনায়কত্বের।"

নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকার মাধ্যমে মার্কস বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি নিজেদের সমর্থন জানান। পোলাণ্ডের মুক্তি সংগ্রামের প্রশ্নে তিনি কৃষকদের সঙ্গে নিতে এবং কৃষিবিপ্লবকে সম্পূর্ণ করতে বলেন। চেক গণতন্ত্রীদের অভ্যুত্থানকেও মার্কস সমর্থন করেন। ১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিসে অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন এটাই প্রথম বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে গৃহযুদ্ধ। এই অভ্যুত্থানে প্রলেতারিয়েতদের পরাজয় ঘটে। এই সময় নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকার 'জুন বিপ্লব' প্রবন্ধে মার্কস সংগ্রামীদের বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং প্রতিবিপ্লবীদের জঘন্য অত্যাচার ঘৃণিত ভাষায় নিন্দা করেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পার্টির অবস্থা এবং সর্বহারাদের ভূমিকা সম্পর্কে নানাবিধ প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় রচিত করেন।

ফরাসী বিপ্লবের পরাজয় এবং প্রতিবিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় তার ঢেউ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় মার্কস বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করার কাজে এগিয়ে আসেন। ১৮৪৮ এর আগেই কোলোনে গণতান্ত্রিক সোসাইটির কংগ্রেসে যোগ দেন এবং নেতা নির্বাচিত হন। আগস্ট মাসের শেষ দিকে মার্কস বার্লিন ও ভিয়েনা যান অগ্রসর শ্রমিক ও গণতন্ত্রীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যে। সেখানে তিনি জনসাধারণকে নিজ নিজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে ডাক দেন ভিয়েনাতে গণতান্ত্রিক সোসাইটির সভায় যোগ দেন এবং বক্তৃতা করেন।

কোলোনে ফিরে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে পত্রিকায় পাল্টা জবাব দিতে লাগলেন। কিন্তু রাইন প্রদেশে গণআন্দোলনের প্রসার ও নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকার প্রভাব দেখে সরকার সৈন্য মোতায়েন

করে। উস্কানি দেবার জন্য অনেক শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মার্কস সতর্ক হলেন। তিনি বিক্ষুব্ধ জনতাকে সাবধান করে দেন যাতে তারা উপযুক্ত সময় আসবার আগেই অভ্যুত্থান না করে। উস্কানিতে কাজ না হওয়ায় সরকার সামরিক আইন জারী করে এবং কয়েকটি পত্র-পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কাউকে শহর ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সামরিক আইনের বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়ালে সরকার ঘৃণিত আইন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। আবার মার্কসের সম্পাদনায় নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকা প্রকাশিত হলো। এই সময় পত্রিকা সম্পাদনার কাজে ও গণতান্ত্রিক সোসাইটি ও ওয়ার্কার্স লীগের কাজে মার্কসকে অনেক সময় দিতে হয়। মার্কসকে ওয়ার্কার্স লীগের চেয়ারম্যান হওয়ার অনুরোধ জানান হলে তিনি সাময়িকভাবে সেই অনুরোধ রাখেন।

১৮৪৮ সালের ৬ই নভেম্বর মার্কস লেখেন ভিয়েনার পতন। অভ্যুত্থান কেন ব্যর্থ হলো তার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখালেন এর মূলে আছে বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি প্রতি বিপ্লবের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে বলেন। ভিয়েনাতে প্রতি বিপ্লবের জয়ে প্রভাবিত হয়ে প্রাশিয়ায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা হতে থাকে। এ ব্যাপারটা মার্কস আগেই অনুমান করেছিলেন। প্রাশিয়ার রাজা বার্লিন থেকে রাজধানী সরিয়ে নেয় ব্রানডেন বার্গে। আইন সভা তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মার্কস ডেপুটিদের বলেন তারা যেন মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করে এবং জনসাধারণ ও সৈন্যদের সাহায্য নেয়। এই আন্দোলনে জনসাধারণকে অংশ নিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ১১ই নভেম্বর মার্কস ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করার আবেদন জানান। জনসাধারণের চাপে ন্যাশনাল এসেমব্লির প্রস্তাব ১৭ই নভেম্বর থেকে আইনে পরিণত হলো। মার্কসের নেতৃত্বে ১৮ই নভেম্বর আর একটি আবেদন জানান হলো ট্যাক্স ধার্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবার। এই উদ্দেশ্যে জন নিরাপত্তা

কমিটি গঠন করা হয়। মার্কসের প্রচেষ্টায় আন্দোলনে প্রাণ এলেও ন্যাশানাল এসেমব্লি বিশেষ কিছু করে না। এর ফলে প্রতিবিপ্লব ৫ই ডিসেম্বর এসেমব্লি ভেঙ্গে দেয়। মার্কস বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রতিবিপ্লব প্রবন্ধগুলিতে দেখালেন প্রতিবিপ্লব জয়ী হওয়ার জন্যে দায়ী বুর্জোয়াদের ভীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা। প্রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লব জয়ী হওয়ায় নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকার লেখকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও হয়রানি শুরু হয়। মার্কস কোর্টে অভিযোগকারীর ভূমিকা নেন। তাঁর জোরাল বক্তব্যে জুরিরা অভিযুক্তদের নির্দোষ বলে রায় দেয়।

১৮৪৯ সালে রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় মার্কস সংগ্রামের রণকৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি দেখলেন শ্রমিকদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে, পেটি বুর্জোয়াদের সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়েছে, শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই বাস্তব পরিস্থিতিতে তিনি সর্বহারাদের নিয়ে পৃথক এক রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করলেন। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে মার্কস পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। কমিউনিস্টদের নিয়ে শ্রমিকদের এক পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তাকে রাজনৈতিক দলে পরিণত করেন। সমগ্র জার্মানিতে ছড়ানো কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নিজে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় জার্মানির বিভিন্ন অংশে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে লড়াই চলছিল। মার্কস এটাকে আরও ব্যাপক করার পরিকল্পনা করলেন। ফ্রান্স, ইতালি ও হাঙ্গেরিতে যে বৈপ্লবিক লড়াই চলছিল ও বৈপ্লবিকতরঙ্গ নতুন ভাবে উঠছিল তার সঙ্গে জার্মানির বিপ্লবকে এক সূত্রে গ্রহিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন মার্কস। কিন্তু মার্কসের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। যারা এইসব বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল সেই পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা দুর্বলতার পরিচয় দেওয়ায় বিপ্লব ব্যর্থ হলো এবং প্রতিবিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে একটার পর একটা বিপ্লব দমন করতে লাগল। বিদ্রোহ দমিত হলে নয়ে রাইনিশে সাইতুং পত্রিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে

প্রাশিয়ার সরকার উঠে পড়ে লেগে যায়। মার্কস অনেক আগেই প্রাশিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন। সেই সুযোগ নিয়ে প্রাশিয়ান সরকার মার্কসকে বিদেশী আখ্যাদিয়ে তাঁকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়। ১৮৪৯ সালের ২৯শে মে পত্রিকার শেষ সংখ্যা লাল কালিতে ছাপা হয়। লেখা হয়— "আপনাদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে নয়ে রাইনিশে সাইতুং-এর সম্পাদকরা আপনাদের সমর্থনের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। তাদের শেষ কথা সব সময়ই ও সব ক্ষেত্রে হবে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি।"

ফ্রাঙ্কফুর্ট, বাডেল, পফালটস-এ অল্প কিছুদিন মার্কস ও এঙ্গেলস অবস্থান করেন। তারপর মার্কস ১৮৪৯ সালের জুন মাসে ফরাসী গণতন্ত্রা কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচয় পত্র নিয়ে প্যারিসে অসেন। প্যারিসে এসে মার্কস শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতাদের এবং আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই সময় বিপ্লবী রোম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট লুই বোনাপার্টের সামরিক কার্যকলাপ জনমনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। প্যারিসে পোপন সমাজতান্ত্রিক কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটি বিদ্রোহের পক্ষ নেয় এই উদ্দেশ্যে যে জয়লাভ করতে পারলে কমিটি নিজেকে কমিউন বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু তাদের বিদ্রোহ সফল হলো না। সরকার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করে এবং নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। মার্কসের ওপর আদেশ জারি করা হলো বহিষ্কারের। ১৯শে জুলাই বহিষ্কারের নোটিশ পান। তিনি এর প্রতিবাদ জানালে বহিষ্কারের আদেশ স্থগিত রাখা হলো। কিন্তু ২৩শে আগস্ট আবার নোটিশ এল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে ফ্রান্স ছাড়তে হবে। ২৬শে আগস্ট মার্কস লণ্ডনে চলে আসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে লণ্ডনেই থাকতে হয়।

১৮৪৮ সাল পর্যন্ত সর্বহারার মহান বিপ্লবীর দর্শনের বনিয়াদ দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮-৪৯ সালে তিনি প্রাধান্য দেন রাজনৈতিক ভাবধারার, রণনীতি ও রণকৌশলের। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির

ওপর গড়ে ওঠে তাঁর নীতি। কিন্তু সেই সময় বিপ্লব সফল হয় নি। তার কারণ হিসেবে লেনিন বলেছেন—"বিশ্ব ইতিহাসের সেই যুগের যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিপ্লবী চেতনা ইতিমধ্যেই কেটে যাচ্ছিল, অথচ সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী চেতনা তখনও পরিণত হয়ে ওঠেনি।"

বিপ্লব পরাস্ত হলেও মার্কস কিন্তু ভেঙ্গে পড়েন নি এবং তাঁর বিপ্লবী চিন্তার গভীর বিশ্বাসে কোনদিন চিড় ধরেনি। কোন হতাশা, কোন সংশয় তাঁর মনে ঠাঁই পায়নি। দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্রের মধ্যেও তিনি নির্ভীকভাবে আপন কর্মে এগিয়ে গেছেন। বিপ্লবী ইয়োহান ফিলিপ বেকারের কাছে এক পত্রে মার্কস লেখেন—"আজ অবধি চিরকাল আমি এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছি যে সত্যিকারের শক্তিশালী প্রকৃতির যেসব মানুষ একবার বিপ্লবের পথে পদার্পণ করেছেন, তাঁরা সকলেই পরাজয় থেকে সর্বদা নব নব শক্তি আহরণ করেছেন এবং ইতিহাসের স্রোতে যত দীর্ঘকাল যাত্রা করেছেন ততই বেশি করে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।" মার্কস তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে উক্ত মন্তব্যের যথাযথ মূল্য দিয়েছেন।

মার্কস প্রথমেই কমিউনিষ্ট লীগের পুনর্গঠন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এঙ্গেলস সমেত অন্যান্য নেতারা ইংল্যাণ্ডে আসেন। কয়েক জন নতুন ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেওয়া হয়। নতুন ব্যক্তিরা হলেন আগস্ট ভিলিখ, লিবক্লেখট, শুরান, একারিয়াস, ফেণ্ডার প্রভৃতি। জার্মানিতে কমিউনিস্ট লীগের অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালে কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্যকে সেখানে পাঠান হয় মার্কস ও এঙ্গেলস লিখিত কমিউনিস্ট লীগের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদন সহ। প্রথম থেকেই পার্টিকে সংগঠিত, একাত্ম ও স্বাবলম্বী করতে মার্কস প্রয়াসী হন। একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপ্লবী অংশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বিপ্লবীদের সঙ্গেও হাঙ্গেরীর

প্রগতিশীল পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

এই সময়ে নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন মার্কস। পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয় হামবুর্গ থেকে নয়ে রাইনিশে সাইতুং ও পলিটিস ওকেনমিসে রিভিউ নাম দিয়ে। ১৮৫০ সালে পত্রিকার দুটি সংখ্যায় মার্কস প্রবন্ধ লেখেন ফ্রান্সে ও জার্মানিতে বিপ্লবের ফলাফলের উপর। ফ্রান্সের শ্রেণী সংগঠন এবং লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার নামে মার্কসের দুটি রচনা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৫০ ও ১৮৫২ সালে। দুটি রচনাই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও তত্ত্বের দিক থেকে। মার্কস রাষ্ট্র ও সর্বহারার একনায়কত্ব সম্পর্কিত শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। নানা প্রবন্ধে এই চিন্তার পরিচয় আছে। ১৮৫২তে ওয়েডমেয়ারকে লিখিত পত্রে লেখেন—"আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা শ্রেণীসংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশের এবং অর্থনীতিবিদরা শ্রেণীর অর্থনৈতিক কাঠামো বর্ণনা করেছেন। আমি নতুন যেটা প্রমাণ করেছি সেটা এই : ১. উৎপাদন বিকাশের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শ্রেণীর অস্তিত্ব ২. শ্রেণী সংগ্রাম শেষ অবধি অনিবার্যভাবেই পর্যবসিত হবে প্রলে-তারিয়েতের একনায়কত্বে, ৩. এই একনায়কত্বও আবার সমস্ত শ্রেণীর অবলুপ্তি এবং শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের একটি স্তরমাত্র।

১৮৫১ সালে প্রাশিয়ার সরকার কমিউনিস্টদের অগ্রগতিতে ভীত হয়। অনেক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জাল দলিল তৈরি করে তাদের মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। এই খবর পেয়ে মার্কস পার্টি কর্মীদের সাহায্যের জন্যে লেখেন কোলোন কমিউনিস্টদের বিচারের ভেতরের কথা। এতে প্রাশিয়ান সরকারের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়। মার্কসের নির্দেশে ১৮৫২ সালে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি তুলে দেওয়া হয়। এর আগেই কমিউনিস্ট লীগে ভাঙন ধরেছিল। লীগের ভিলিখ এবং শাপারের নেতৃত্বে কয়েকজন সদস্য জার্মানিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মার্কস একে

হঠকারী বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তে ইচ্ছাশক্তিকে বিপ্লবের চালিকা শক্তি মনে করা ঠিক হবে না। "বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে গেলে, আধিপত্যের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে তুলতে হলে আরও ১৫, ২০, ৫০ বছর গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে।" কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মার্কসকে সমর্থন করা সত্ত্বেও ভিলিখ-শাপার তাদের নীতি বর্জন করে না। তারা নিজস্ব কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই উপদল সর্বপ্রকার প্রলেতারীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৮৫২ সালের এক প্রচার পুস্তিকায় এদের ব্যঙ্গ করে মার্কস ও এঙ্গেলস লেখেন প্রবাসী মহাপুরুষবৃন্দ।

লণ্ডন বাসের প্রথম দশ বছর সমগ্র ইউরোপে ছিল প্রতিক্রিয়ার কাল। বিপ্লব-সংগ্রাম বন্ধ, বিপ্লবী সংগঠনগুলি ভেঙ্গে গেছে। তাই বলে মার্কস চুপ করে বসেছিলেন না। অনমনীয় দৃঢ়তা ও অপরাজেয় আশাবাদ নিয়ে সামনের পানে এগিয়ে গেছেন। দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র তো তাঁর নিত্য সঙ্গী ছিল। তার ওপর পত্রিকা সম্পাদনা করা বা অধ্যাপনা করা কোন কাজই তখন তাঁর ছিল না। অখণ্ড অবসর। এই অবসরে তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নে রত হন এবং লেখার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এক জায়গায় থাকতেন না। তাই দুই বন্ধুর মধ্যে পত্র বিনিময় হোত। প্রতিটি পত্রেই গভীর আশা ও প্রত্যয় ব্যক্ত হোত। লেনিন লিখেছেন— "বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস, শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেদের সরাসরি বিপ্লবী কর্তব্যসমূহ শেষ পর্যন্ত রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানানোর ক্ষমতা, বিপ্লবের সাময়িক অসাফল্যের পর কাপুরুষ নাকি কান্নায় প্রশ্রয় না দিয়ে মনের দৃঢ়তা রক্ষা।"

এই সময় মার্কস প্রতিদিন সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে পড়তেন, নোট করতেন। মার্কস ১৮৫১ সালে আগস্ট মাসে নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন পত্রিকার সংবাদদাতা

হন। অনেক প্রবন্ধ তিনি পত্রিকাটিতে লেখেন। নয়েওডার সাইতুং পত্রিকাতেও অনেক প্রবন্ধ লিখে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের খবরাখবর তিনি রাখতেন। স্পেন বিপ্লব ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে বেশ কটি প্রবন্ধ লেখেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রগতিশীল বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী যুদ্ধকে বিরাট জাতীয় আন্দোলন বলে উল্লেখ করেন। ভারতের ওপর তিনি দুটি বড় প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধ দুটির নাম—আনব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া এবং ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া। জার্মানি ও আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও সংযোগ রাখতেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতির প্রতি গভীরভাবে মনযোগ দেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণও করেন, চার্টিস্ট আন্দোলনের বামপন্থী নেতা জোনসকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। জোনসের সাময়িক পত্র নোটস টুদি পিপল এবং পিপলস পেপার-এ তিনি প্রবন্ধ লেখেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি পুঁজিবাদী সমাজের ওপর অলোকপাত করেন। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। মার্কস আগেই অনুমান করেছিলেন ধনতান্ত্রিক দেশে অর্থনৈতিক সংকট আসবে এবং সেই অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকট রূপে দেখা দেবে। ১৮৫৭ সাল থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থ নৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকট রূপে দেখা দিল। বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব—বিদ্রোহ ঘটতে শুরু হয়। প্রত্যেক দেশের মেহনতী মানুষের সংগ্রামকে মার্কস স্বাগত জানান। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই সময় মার্কস তাঁর অর্থশাস্ত্রের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে উদ্যোগী হন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয় কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি। এই বইতেই প্রথম উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব প্রকাশ পায় এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ পায় অর্থ ও অর্থের আবর্তন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

বইটির ভূমিকায় বলা হয়—"মানবজীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতকগুলি অনিবার্য ও ইচ্ছা নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন সম্পর্কে, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন শক্তি বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলির সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, সেই আসল বনিয়াদ, যার উপর গড়ে উঠে আইনগত আর রাজনৈতিক উপরি কাঠামো এবং সামাজিক চেতনার নিদিষ্ট রূপগুলি হয় তারই অনুরূপ। বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবন প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়। বরং তার বিপরীত—মানুষের সামাজিক সত্তা নির্ধারণ করে তার চেতনাকে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন শক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত লাগে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের অর্থাৎ আইনের ভাষায়—এতদিন যে সম্পত্তি সম্পর্কের মধ্যে থেকে উৎপাদন শক্তি সক্রিয় ছিল, তারই সঙ্গে। যে সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় উৎপাদন শক্তির শৃঙ্খলে। তখন শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরি কাঠামোও কম বেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়।"

এরপর প্রকাশিত হয় মার্কসের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বই যার নাম ক্যাপিটাল বা পুঁজি। বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে আর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। শেষ দুটি খণ্ড তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু হলো—পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ। এখানে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সম্পর্ক, পুঁজিবাদী এবং মজুরী-শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক। বইটি সম্পর্কে মার্কস নিজে বলেছেন—

"আমার বইয়ের যেটা সেরা জিনিস তা হল ১. শ্রমের প্রকাশ উপযোগ মূল্যে ঘটছে না বিনিময় মূল্যে ঘটছে তার নিরিখে শ্রমের বিবিধ চরিত্র—যার ওপর প্রথম অধ্যায়ে জোর দেওয়া হয়েছে, ২. মুনাফা, সুদ, জমির খাজনা ইত্যাদি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্যের বিশেষ রূপ এবং নির্বিশেষে তার তত্ত্বানুসন্ধান।" মার্কস প্রথম উদ্বৃত্ত মূলের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন।

মার্কসের মৃত্যুর পর পরমবন্ধু এঙ্গেলসের প্রচেষ্টায় ক্যাপিটাল বা পুঁজির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু হলো—পুঁজির আবর্তন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ। পুঁজি নিরন্তর গতিশীল। সেই গতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো পুঁজির মূল্যের বৃদ্ধি। পুঁজি তার পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তিনটি স্তর অতিক্রম করে এবং তিনটি রূপ পরিগ্রহ করে যথাক্রমে অর্থ—উৎপাদন এবং পণ্য। তৃতীয় খণ্ডে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের মালিকদের যে লাভ হয় তার সবই আসছে বাড়তি মূল্য থেকে। আবার বাড়তি মূল্য পরিবর্তিত হচ্ছে মুনাফায়।

ক্যাপিটাল বা পুঁজি বইতে অর্থনীতি এবং সামাজিক রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে। লেনিনের মতে—"পুঁজি কেবল বিজ্ঞানীর মহা প্রতিভা দীপ্ত বুদ্ধির ফল নয়, সংগ্রামীর, বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ হৃদয়ের মহান উদ্দীপনারও ফল বটে। এই রচনার চরিত্র বৈশিষ্ট্য হল বিপ্লবী মনোভাবের সঙ্গে কঠোর ও সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিকতার, পার্টি আনুগত্যের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। পুঁজি সামাজিক ঘটনার তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে নির্মম বস্তু নিষ্ঠার অসামান্য একটি নিদর্শন……কদাচিৎ কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক রচনায় দেখতে পাবেন এতটা অন্তঃকরণ পশ্চাদপদ দৃষ্টি-ভঙ্গির মুখপাত্রদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সামাজিক শ্রেণী, গ্রন্থকারের মতে, সামাজিক বিকাশের গতিরোধ করে, তাদের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে

এত জ্বালাময়ী ও উদগ্র বাদ প্রতিবাদমূলক উদ্‌গীরণ।”

১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে সেণ্ট মার্টিন্‌স হলে এক সভায় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন দেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতারা এবং প্রবাসী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা যোগ দেন। এঁরা এক পরিচালন কমিটি নির্বাচন করেন। মার্কস নির্বাচিত হন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে। প্রকৃত পক্ষে তিনিই ছিলেন আন্তর্জাতিকের সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা। আন্ত-র্জাতিকের জন্যে দলিল রচনা করেন মার্কস। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী জনগণের সংঘের উদ্বোধনী ভাষণ এবং সংঘের অস্থায়ী নিয়ম-কানুন নামে দুটি দলিল তিনি লেখেন। এই সংগঠন প্রথম থেকে বাধাবিপত্তির মুখে পড়ে। বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা সংগঠন দখল করার চেষ্টা করে। ১৮৬৫ সালের লণ্ডন সম্মেলনে এবং ১৮৬৬ সালে জেনেভা সম্মেলনে যোগদেন এবং সংগঠনের শ্রেণী চরিত্র রক্ষার জন্যে নেতৃত্ব দেন। ১৮৬৮ সালে ব্রাসেলস কংগ্রেস এবং ১৮৬৯ সালের বাসেল কংগ্রেস জমির জাতীয়করণ এবং উৎপাদনের যৌথ মালিকরা মেনে নেয়। পেটিবুর্জোয়া মতাদর্শীরা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়। এটা আন্তর্জাতিকের প্রথম সাফল্য। বলা বাহুল্য এর পর থেকে আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী সমাজ-তান্ত্রিক রূপ নিয়ে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিকের শাখা স্থাপিত হয়। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মার্কসের।

১৮৭০ সালে ফ্রান্সে ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে মার্কস যুদ্ধের প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে শ্রমিক শ্রেণীর রণ কৌশল সম্পর্কে এক প্রস্তাব পেশ করেন। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে অভ্যুত্থান শুরু হয়। ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চে প্যারী কমিউন বা শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কস বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিকের শাখা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানান প্যারী কমিউনের সমর্থনে অভিযান চালাতে। কিন্তু মাত্র বাহাত্তর দিন এই সরকার টিকে ছিল। এই সরকারের পতনের কারণ হিসেবে

তিনি বলেছেন শত্রুপক্ষকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে না পারা এবং পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙ্গে না ফেলা। আগের সমস্ত বিপ্লবেই শাসক শ্রেণীর মধ্যে কিছু রদবদল হয়েছে—এক ধরনের শোষণের পরিবর্তে নতুন শোষণ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। এরকম বিপ্লবে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এতে কেবল হাত বদল হয়। শ্রমিক শ্রেণীকে শুধুমাত্র পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজের হাতে নিলেই চলবে না তাকে ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। "যেটা কর্তব্য তা হলো সাবেকী সরকারী ক্ষমতার নিপীড়ক অঙ্গগুলিকে পরিষ্কার কেটে বাদ দেওয়া, সেই ক্ষমতারই ন্যায্য কর্তব্যগুলি সমাজের উপর অন্যায় ভাবে আধিপত্য দখলকারী একটি কর্তৃত্বের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া এবং সমাজেরই দায়িত্বশীল সেবকদের হাতে অর্পন করা।" ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ বইতে তিনি কমিউনের ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করেও শ্রমিক শ্রেণীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—" কমিউন সমেত শ্রমিক শ্রেণীর প্যারিস চিরদিন এক নতুন সমাজের গৌরব-দীপ্ত অগ্রদূত হিসেবে নন্দিত হবে। শ্রমিক শ্রেণীর বিশাল হৃদয়ে তার শহীদেরা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইতিহাস ইতিমধ্যেই তার জল্লাদদের স্তম্ভগাত্রে পেরেকবিদ্ধ করেছে, সেখানে হঠাৎ তাদের পুরোহিতদের শত প্রার্থনাতেও তাদের নিষ্কৃতি মিলবে না।" আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সকল সদস্যের স্বাক্ষরিত এক দলিলে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে সর্বহারাদের শেষলক্ষ্য সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে এবং কমিউন ধরনের নতুন শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

প্রথম আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপের অবসান হলেও মার্কস চুপ করে বসে ছিলেন না। বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং নিয়মিত লেখার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এলায়েন্স অব সোসালিস্ট ডেমোক্রাসি নামক বইতে মার্কস ও এঙ্গেলস বাকুনিনপন্থীদের বিভেদমূলক কাজের সমালোচনা করেন। স্পেন,

ইতালি, ফ্রান্স, রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে বাবুনিনপন্থীরা কিভাবে বিপথে চালিত করতে সচেষ্ট এবং কিভাবে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তার স্বরূপ তুলে ধরেন। ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম বইয়ে মার্কস লাসালপন্থীদের কঠোর সমালোচনা করেন। লাসালপন্থীরা জার্মানিতে মার্কসবাদ প্রচারে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এরা সুবিধাবাদী নীতির পোষক ছিল। এই বইয়ে লাসালপন্থীদের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজের ভবিষ্যৎ রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। বইটিতে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এবং সমাজতন্ত্রী সমাজের ছুটি স্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মার্কস দেখান সমাজতন্ত্রী সমাজের প্রথম স্তরে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শ্রম অনুসারে বণ্টন করার নীতি প্রাধান্য পাবে আর দ্বিতীয় স্তরে "যখন শ্রম বিভাগের মধ্যে ব্যক্তি মানুষকে আর আবদ্ধ রাখা হবে না এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে বৈষম্য লোপ পাবে, যখন শ্রম কেবলমাত্র জীবিকা উপার্জনের উপায় মাত্র না হয়ে জীবনের প্রধান চাহিদা হয়ে দাঁড়াবে, যখন ব্যক্তি মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধিপাবে এবং যৌথভাবে উৎপাদিত ধনের উৎস মুখ খুলে যাবে—তখন একমাত্র তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সীমিত গণ্ডিকে অতিক্রম করা সম্ভব হবে সম্পূর্ণভাবে এবং সমাজের পতাকাতে লেখা থাকবে প্রত্যেকের কাছ থেকে তার মধ্যে সাধ্যমত নিতে হবে আর দিতে হবে তাকে তার প্রয়োজন মতো।"

মার্কস আগেই জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে সাবধান করে বলেছিলেন দলের মধ্যে তত্ত্ব সম্পর্কে ধোঁয়াটে ভাব রয়েছে। এটা দূর করতে না পারলে তার ফল হবে মারাত্মক। মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী মিলে গিয়েছিল। জার্মানির তিন তাত্ত্বিক সংশোধনবাদী নেতা 'জু রিখ এর ইস্তাহার' লিখে শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। এই তিন নেতা হলো হেখবের্গে, বার্ণস্টাইন এবং শরাম। এদের মতবাদকে খণ্ডন করে মার্কস ও এঙ্গেলস লেখেন 'সার্কুলার পত্র'।

'সার্কুলার পত্রে' লেখা হয়— "দৃঢ় রাজনৈতিক বিরোধিতার পরিবর্তে একটা সাধারণ সালিশি, সরকার ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করানো ও নিজেদের দিকে টেনে আনার চেষ্টা উপরওয়ালাদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নির্ভীক প্রতি-রোধের পরিবর্তে দীনহীন নতি স্বীকার এবং শাস্তি ন্যায্য হয়েছে বলে কবুলতি"। প্রকৃতপক্ষে সংশোধনবাদী নেতৃত্রয় শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের বিরোধিতা করে তাদের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলেছে। মার্কস ও এঙ্গেলস এদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কঠোর সমালোচনা করে পার্টিকে শ্রমিক শ্রেণী সতর্ক করে দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে মার্কসের প্রভাব ছিল অপরিসীম এ-বিষয়ে এঙ্গেলস লিখেছেন—"তত্ত্বের ও প্রায়োগিক দিক থেকে মার্কস নিজের জন্যে এমন একটা স্থান অধিকার করে নিয়েছেন যে, দুনিয়া জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ লোকেরা তাঁর ওপরে পুরো বিশ্বাস রাখে। সংকটময় সন্ধিক্ষণে এরা তাঁর কাছেই উপদেশের জন্যে আসে এবং সাধারণত দেখে যে, তাঁর উপদেশই সর্বাপেক্ষা ভালো।"

## মার্কসের জীবনাবসান

দারিদ্র এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যে ষাটের দশকের শেষদিক থেকে মার্কসের শরীর খারাপ হতে থাকে। শুধু মার্কসের নয়, স্ত্রী য়েনীর স্বাস্থ্যই খারাপের দিকে যেতে থাকে। ১৮৭৪ সালে মার্কসের পেটের রোগ গুরুতর হয়। ১৮৮০ সালে য়েনীর পেটে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। ১৮৮১ সালে য়েনী শয্যাশায়ী। ঠিক সময়েই মার্কসও রোগে পড়েন। পেটের রোগতো ছিলই তার সঙ্গে দেখা দিল প্লুরিসি ও নিউমোনিয়া। কন্যা এলেওনোরার স্মৃতি কথা থেকে জানা যায়—"সেই সকালের কথা আমি কখনই ভুলব না, যখন মামানির ঘরে প্রবেশ করার মতো শক্তি তাঁর হয়েছে বলে তিনি অনুভব করলেন। মনে হয় না যে রোগে ভেঙ্গে পড়া কোন প্রৌঢ় আর এক মুমুর্ষু প্রৌঢ়া পরস্পরের কছে থেকে চিরবিদায় নিতে চলেছেন এযেন মিলিত জীবনের প্রবেশ লগ্নে এক তরুণী প্রেমিকা আর প্রেমিক যুবক।"

১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর য়েনীর মৃত্যু হয়। য়েনীর মৃত্যুতে মার্কস শোকে এত মুহ্যমান হয়ে পড়েন যে স্ত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার সময় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। শারীরিক দিক থেকেও তিনি খুবই তুর্বল ছিলেন। য়েনীর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর এঙ্গেলস বলেন—"কেবল তাঁর স্বামীর অদৃষ্ট শ্রম ও সংগ্রামের ভাগীদারই ছিলেন না, তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে এবং প্রবল আবেগের সঙ্গে সেসব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।"

১৮৮২ সালে মার্কস কন্যা জেনীর কাছে আর্জান্তিজয়তে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আলজিরিয়াতে যান। সেখানে ঠাণ্ডা লাগার রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। আলজিরিয়া ছেড়ে একমাস থাকেন মণ্টে কর্লোতে। কন্যা জেনীর কাছে প্রায় তুমাস কাটিয়ে আরেক কন্যা লরার

কাছে যান। লরা তখন থাকতেন সুইজারল্যাণ্ডে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন। ১৮৮৩ সালের ১২ই জানুয়ারী মার্কস খবর পান কন্যা জেনী মারা গেছে। জেনী যখন মারা যায় তখন তার বয়েস মাত্র ৩৮ বছর। বড় কন্যার মৃত্যুর খবর মার্কসকে মূক করে দেয়। তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গেছে। খুব দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। অবশেষে ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ বিরাট কর্ম বহুল জীবনের এবং সর্বহারার মহান নেতার জীবনাবসান ঘটে। লণ্ডনের হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে ১৭ই মার্চ মার্কসকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির পাশে এক ভাষণে এঙ্গেলস বলেন "যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তার নাম, অক্ষয় থাকবে তাঁর কাজ।"

মার্কসের মৃত্যুর পর বেকারকে এঙ্গেলস লেখেন—"গতকাল বেলা পৌনে তিনটের সময় মিনিট দুয়েকের জন্য আমরা তাঁকে একা রেখে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি তিনি আরাম কেদারায় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমাদের পার্টির সবচেয়ে ক্ষমতাবান মস্তিষ্ক চিন্তা থেকে বিরত হলো, সবচেয়ে শক্তিশালী হৃদয় বলে এযাবৎ অক্ষয় আমি যাকে জানতাম তার স্পন্দন থেমে গেল। আর এক লেখায় বলেন—"মানব জাতির এক মাথা নীচে নেমে গেল, আর যে মাথা আমাদের কালের সেরা মাথা।"

মার্কস ছিলেন সংগ্রামী পুরুষ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। জীবনে কোনদিন কোন অবস্থাতেই তিনি থেমে থাকেন নি। তিনি শুধু তত্ত্বই প্রচার করেন নি, সেই তত্ত্বের প্রয়োগ কৌশলের ওপরও গুরত্ব আরোপ করেছেন। তত্ত্বকে উপযুক্ত পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে না পারলে কোন সাফল্য আসে না। মূল তত্ত্বকে সমান রেখে নিজনিজ দেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী রণকৌশল ও রণনীতি গ্রহণ করার শিক্ষাও মার্কস দিয়ে গেছেন। লেনিনের কথায় মার্কসের শিক্ষা অপরাজেয় কারণ এটাসত্য। মার্কস-বাদকে আপ্তবাক্য বলে মনে করলে ভুল হবে। মার্কসবাদ হলো

বিকাশমান শিক্ষা। মার্ক্সের শিক্ষাকে গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে মূল লক্ষ্যের দিকে।

আজীবন তিনি মানুষেয় জন্যে লড়াই করেছেন। কোনদিন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। কথাটি মার্ক্সের জীবনের প্রতি সব থেকে বেশি প্রযোজ্য। নিজের জীবন দিয়ে মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি গেয়ে গেছেন জীবনের গান। সে গান নিপীড়িত শোষিত, অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির মহামন্ত্র।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির বিশেষ অংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া হলো। অনুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছে মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে।

## এঙ্গেলস সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৫৬

…people's paper পত্রিকাখানির বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত পরশু একটি ছোটোখাটো ভোজসভা হয়েছিল। এবার আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করি, কেননা মনে হয়েছিল এটা সময়োপযোগী হবে, গ্রহণ করি আরো এই জন্য যে, দেশান্তরীদের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম আমন্ত্রিত ( পত্রিকায় তাই ঘোষণা করা হয় ), প্রথম স্বাস্থ্যপান প্রস্তাবও জোটে আমার ভাগ্যেই ; ঠিক হয়েছিল সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সার্বভৌমতা নিয়ে আমাকে বলতে হবে। অতএব, ইংরেজীতে ছোট একটি বক্তৃতা করেছিলাম, যা ছাপাতে আমি চাই না। আমার মনে মনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা সিদ্ধ হয়েছিল। যাকে আড়াই শিলিং দিয়ে টিকিট কিনতে হয়েছিল সেই শ্রী তালাঁদিয়ে এবং ফরাসী ও অন্যান্য দেশান্তরী দঙ্গলের বাকী সকলেই সুনিশ্চিত হয়েছে যে, আমরাই হচ্ছি চার্টিস্টদের একমাত্র অন্তরঙ্গ মিত্র এবং যদিও আমরা প্রকাশ্যে জাহির করি না এবং চার্টিজমের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে দহরমমহরমটা ফরাসীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি, তবু যে স্থানটি ঐতিহাসিকভাবে আমাদের প্রাপ্য সে স্থানটি যে সময় আবার আমরা দখল করতে পারি। এবং সেটা আরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই জন্য যে, পিয়া-র সভাপতিত্বে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর সভায় শেনৎসার নামক সেই বুড়ো জার্মান গর্দভটা এগিয়ে এসে মারাত্মক গিল্ড সংকীর্ণতায় জার্মান 'পণ্ডিতদের' ও বুদ্ধিজীবী কর্মীদের, চুটিয়ে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে, যারা তাদের ( গর্দভদের ) গাছে তুলে দিয়ে সরে পড়েছে এবং অন্যান্য জাতির সামনে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করতে তাদের বাধ্য করেছে।

প্যারিসে থাকার সময় থেকেই তো এই শেনৎসারকে তুমি জানো। বন্ধু স্থাপারের সঙ্গে আরও কয়েকবার আমার সাক্ষাৎকার হয়েছে, দেখেছি সে অত্যন্ত অনুতপ্ত পাপী। গত দুই বছর ধরে সে যে অবসর গ্রহণ করে আছে তাতে মনে হয় যেন তার মানসিক শক্তির বাহার বেড়েছে। বুঝতেই পারছ, যে কোনো বিপদ আপদে এই লোকটিকে হাতে রাখা এবং বিশেষ করে ভিলিখের কবল থেকে বাইরে রাখা সব সময়ই ভাল। স্থাপার এখন উইণ্ডমিল ষ্ট্রীটের গর্দভদের প্রতি রেগে লাল হয়ে আছে।

স্টেফেনের কাছে লেখা তোমার চিঠিখানি আমি পেঁাছিয়ে দেব। লেভির চিঠিখানা ওখানে নিজের রেখে দেওয়া তোমার উচিত ছিল। যেগুলি আমার কাছে ফেরত পাঠাতে বলব না, সেই চিঠিগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কাজটি করবে। চিঠিগুলি যত কম ডাকে দেওয়া হয় ততই ভাল। রাইন প্রদেশ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, ভবিষ্যতে এমন কিছু দেখছি যা থেকে পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পাওয়া যায়। পুরাতন বিপ্লবে মাইন্স ক্লাবিস্টদের যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থায় পড়তে আমরা বাধ্য হই কিনা তা বহুলাংশে নির্ভর করছে বার্লিনের ঘটনাবলী কী রূপ নেবে তার উপর। ব্যাপার তাহলে আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। রাইনের অপর পারের আমাদের সুযোগ্য বন্ধুদের সম্পর্কে তো আমরা কম ওয়াকিবহাল নই! কৃষক যুদ্ধের এক ধরনের দ্বিতীয় সংস্করণের দ্বারা প্রলেতারীয় বিপ্লবকে সহায়তা করার উপর জার্মানিতে সবকিছু নির্ভর করবে। তাহলে চমৎকার ব্যাপার হবে…

## এঙ্গেলস সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭

…তোমার 'ফৌজ' চমৎকার হয়েছে। শুধু এর আয়তন দেখে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কারণ, এতখানি পরিশ্রম করা তোমার পক্ষে খুব ক্ষতিকর। যদি জানতাম যে রাত্রি জেগে কাজ করতে শুরু করবে, তাহলে বরং, ব্যাপারটা চুলোয় দিতেই রাজী হতাম।

উৎপাদন-শক্তি ও সামাজিক সম্পর্কের সংযোগ সম্পর্কিত আমাদের ধারণার নির্ভুলতা ফৌজের ইতিহাস থেকে যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর কিছু থেকে তত নয়। সাধারণভাবে, অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, ফৌজের মধ্যেই প্রাচীনেরা সর্বপ্রথম একটি পুরাপুরি মজুরি-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অনুরূপভাবে, রোমকদের মধ্যে **peculium castrense** ছিল প্রথম আইনী রূপ, যাতে অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিবারের পিতা ছাড়া অন্যদের অধিকারও স্বীকৃত হয়। Fabri কর্পোরেশানের মধ্যে গিল্ড ব্যবস্থাও প্রথম দেখা দেয়। এখানেও দেখি যন্ত্রপাতির প্রথম ব্যাপক ব্যবহার। এমনকি ধাতুর বিশেষ মূল্য এবং মুদ্রা রূপে তাদের ব্যবহারের ভিত্তিটার গুরুত্ব গোড়াতে সম্ভবত ছিল সামরিক—গ্রিমের প্রস্তরযুগ শেষ হবামাত্রই একটি শাখার মধ্যে শ্রমবিভাগও সর্বপ্রথম ফৌজেই ঘটে। বুর্জোয়া সমাজে রূপগুলির সমগ্র ইতিহাসটি এখানে আশ্চর্য স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়ে আছে। যদি কোনদিন সময় পাও, তবে এইদিক থেকে সমস্যাটা নিয়ে কাজ কোরো।

আমার মতে তোমার বিবরণীতে মাত্র এই কয়টি বাদ পড়েছে : ১) আসল ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বৃহদাকারেও তৎক্ষণাৎ আবির্ভাব কার্থেজীয়দের মধ্যে ( আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কার্থেজীয় ফৌজ সম্পর্কে বার্লিনের এক ভদ্রলোকের লেখা একখানি বই পড়ে দেখব।

বইখানির কথা আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি)। ২) পঞ্চদশ শতকে এবং ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম দিকে ইতালিতে ফৌজ ব্যবস্থার বিকাশ। রণকৌশলগত ধূর্ততা সেখানেই বেরিয়েছিল। কনডোটিয়েররা পরস্পরের সঙ্গী কী ভাবে লড়াই করত ম্যাকিয়াভেলী তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাসে তার যে বর্ণনা দিয়েছেন ( জিনিসটা তোমার জন্য নকল করে পাঠাব ) তা অত্যন্ত কৌতুককর। ( না, যখন ব্রাইটনে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব—কবে ? —তখন ম্যাকিয়াভেলীর বইখানি সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তাঁর ফ্লোরেন্সের ইতিহাস এক অপূর্ব সৃষ্টি। ) এবং সর্বশেষে ৩) এশীয় সামরিক ব্যবস্থা, যা প্রথমে পারসিকদের মধ্যে এবং পরে নানাভাবে পরিবর্তিত আকারে মোগল, তুর্কী ইত্যাদির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে…

## ল, কুগেলমান সমীপে মার্ক

লণ্ডন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৫

গতকাল আপনার পত্র পেয়েছি। চিঠিখানি আমার কাছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেগেছে। আপনি যে বিষয়গুলি উত্থাপন করেছেন এখন আলাদা আলাদাভাবে সেগুলির জবাব দেব।

সর্বপ্রথম লাসালের প্রতি আমার মনোভাব সংক্ষেপে বিবৃত করব। তিনি যখন আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তখন আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ঃ ১) কারণ তাঁর আত্মম্ভরী হামবড়াইভাব এবং সেই সঙ্গে আমার ও অন্যান্যদের লেখা থেকে তার নির্লজ্জতম চুরি ; ২) কারণ, তার রাজনৈতিক কৌশলকে আমি নিন্দা করেছি ; ৩) কারণ, তাঁর আন্দোলন সুরু করার আগেই আমি এখানে লণ্ডনে বসে তাঁর কাছে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করেছি ও 'প্রমাণ করেছি' যে, 'প্রুশীয় রাষ্ট্রের' দ্বারা প্রত্যক্ষ সমাজতান্ত্রিক হস্তক্ষেপটা বাজে কথা। আমার কাছে লেখা তাঁর

চিঠিগুলিতে ( ১৮৪৮—১৮৬৩ সাল ) এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তিনি বরাবরই নিজেকে আমি যে পার্টির প্রতিনিধিত্ব করি সেই পার্টিরই সমর্থক বলে ঘোষণা করে এসেছেন। লণ্ডনে যে মুহূর্তে ( ১৮৬২ সালের শেষাশেষি ) তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আমার সঙ্গে চাতুরী করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই মুহূর্তে আমার এবং পুরানো পার্টির বিরুদ্ধে 'শ্রমিকদের একাধিপতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করলেন। এসব সত্ত্বেও আন্দোলনকারী হিসাবে তাঁর কাজের আমি স্বীকৃতি দিয়েছি, যদিও তাঁর স্বল্পকালীন কর্মজীবনের শেষ দিকে সেই আন্দোলনের প্রকৃতিও আমার কাছে ক্রমেই বেশী করে দ্ব্যর্থক বলে মনে হয়েছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু, পুরাতন বন্ধুত্ব, কাউণ্টেস হাৎসফেলেদর কান্নাকাটিভরা সব চিঠি, বেঁচে থাকতে যাঁকে তারা যমের মতো ভয় করত তাঁর প্রতি বুর্জোয়া পত্রিকাগুলির কাপুরুষোচিত ঔদ্ধত্যে ক্রোধ, এই সবকিছুর ফলে আমি হতচ্ছাড়া ব্লিন্দের বিরুদ্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করি। ( বিবৃতিটি হাৎসফেলদ Nordstern পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। ) সে বিবৃতিতেতে আমি লাসালের কাজকর্মেব অন্তর্বস্তু সম্পর্কে কোনো আলোচনা করিনি। এই একই কারণে এবং আমার কাছে মারাত্মক বলে মনে হয়েছিল যেসব উপাদান তা দূর করতে পারব এই আশায় এঙ্গেলস ও আমি Social Demokrat পত্রিকায় লিখব বলে প্রতিশ্রুতি দিই ( পত্রিকাখানি উদ্বোধনী ভাষণের একটি তর্জমা প্রকাশ করে এবং পত্রিকাখানির অনুরোধে আমি প্রুধোঁর মৃত্যু উপলক্ষে প্রুধোঁ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছি), এবং শুভাইৎসার তাঁর সম্পাদকমণ্ডলীর একটি সন্তোষজনক কর্মসূচী আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবার পর, আমরা নিয়মিত লেখক রূপে আমাদের নাম প্রকাশের অনুমতি দিই। বেসরকারী সভ্য হিসাবে, ভি. লিবক্লেখতের সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকাটা আমাদের পক্ষে আরও একটা গ্যারাটি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আমাদের হাতে প্রমাণ এসে গেল যে, লাসাল আসলে

পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। করেছেন তিনি তখন বিসমার্কের সঙ্গে রীতিমতো একটা চুক্তি করেছেন। (অবশ্য, নিজের হাতে কোনরূপ গ্যারান্টি না রেখে)। কথা ছিল ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তিনি হামবুর্গে যাবেন এবং সেখানে (উন্মাদ শ্রাম ও প্রুশীয় পুলিশের গুপ্তচর মারের সঙ্গে একযোগে) বিসমার্ককে 'বাধ্য করবেন' শ্লেজভিগ-হোলষ্টাইনকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে, অর্থাৎ শ্রমিকদের নামে ইত্যাদিতে তার অন্তর্ভুক্তি ঘোষণা করবেন, পরিবর্তে বিসমার্ক সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং কিছু কিছু সোশ্যালিস্ট বুজরুকির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দুঃখের কথা, এই প্রহসনের শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে যেতে লাসাল পারলেন না! তাহলে তিনি ভয়ানক হাস্যকর ও নির্বোধ বলে প্রমাণিত হতেন, ফলে চিরকালের জন্য এ ধরনের সমস্ত চেষ্টারই অবসান ঘটত।

লাসাল যে এইভাবে বিপথগামী হয়েছিলেন তার কারণ, তিনি ছিলেন হের মিকেল ধরনের 'বাস্তব রাজনীতিবিদ' যদিও তাঁর কাঠামো ছিল অনেক প্রকাণ্ড. লক্ষ্যও ছিল অনেক বড়। (প্রসঙ্গত বলে রাখি, বহুদিন আগেই মিকেলকে আমি যথেষ্ট চিনে রেখেছি তাই বুঝতে পারি, তিনি যে এগিয়ে এসেছিলেন তার কারণ, এই তুচ্ছ হ্যানোভারীয়ান উকিলটিকে নিজের চৌহদ্দির বাইরে সারা জার্মানিতে নিজের কণ্ঠস্বর শোনাতে পারার এবং তাতে করে হ্যানোভারীয়ান স্বদেশে এই পরিস্ফীত 'বাস্তবতার' প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারার ও প্রুশীয় আনুকূল্যে হ্যানোভারীয়ান মিরাবো সাজার একটি চমৎকার সুযোগ দেয় ন্যাশনাল এসোসিয়েশন। ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে যোগদান করে 'প্রুশীয় শীর্ষটি' আঁকড়ে থাকার উদ্দেশ্যে মিকেল ও তাঁর বর্তমান বন্ধুরা যেমন প্রুশীয় রাজপ্রতিনিধি প্রবর্তিত 'নূতন যুগকে' লুফে নেন, তারা যেমন সাধারণভাবে প্রুশীয় রক্ষণাবেক্ষণে নিজেদের 'নাগরিক গর্ববোধ' বিকশিত করে তোলেন, ঠিক তেমনই লাসালও চেয়েছিলেন উকার-মার্কের দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের মার্কুইস পোজার

ভূমিকা গ্রহণ করতে, আর বিসমার্ক নেবেন তাঁর প্রুশীয় রাজ্যের মধ্যে আড়কাটির ভূমিকা। তিনি শুধু ন্যাশনাল এসোসিয়েশনের ভদ্রলোকদের অনুকরণ করেছিলেন। কিন্তু এই ভদ্রলোকের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে 'প্রুশীয় প্রতিক্রিয়াকে' আবাহন করেছিলেন আর লাসাল বিসমার্কের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থে। লাসালের চেয়ে এই ভদ্রলোকদের যৌক্তিকতা ছিল বেশী, কারণ, বুর্জোয়ারা ঠিক তাঁদের নাকের সম্মুখের স্বার্থটাকেই 'বাস্তবতা' বলে মনে করতে অভ্যস্ত, তাছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বত্রই, এমনকি সামন্ততন্ত্রের সঙ্গেও আপোষ করেছে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃতিই হল এই যে, তাকে আন্তরিকভাবে 'বৈপ্লবিক' হতেই হবে।

লাসালের মতো থিয়েটারী দম্ভে ভরা চরিত্রের (চাকুরি, মেয়রের পদ ইত্যাদি তুচ্ছ ঘুষ দিয়ে, অবশ্য, তাঁকে কেনা যায় না) পক্ষে এ চিন্তা ছিল দারুণ প্রলোভনের যে, সরাসরি প্রলেতারিয়েতের হিতার্থে একটি কীর্তি সম্পন্ন করছেন ফের্দিনাঁ লাসাল! আসলে সে কর্তির আনুষঙ্গিক বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কে তিনি এতখানি অজ্ঞ ছিলেন যে, নিজের কাজের সমালোচনামূলক বিচার করার শক্তি তাঁর ছিল ওদিকে, ১৮৪৯-৫৯ সালের প্রতিক্রিয়াকে বরদাস্ত করতে এবং জনসাধারণের বিহ্বলতাকে চুপ করে দেখে যেতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে প্রবৃত্ত করিয়েছিল যে ঘৃণিত 'বাস্তব রাজনীতি,' তার ফলে জার্মান শ্রমিকদের 'মনোবল এতখানি ভেঙ্গে পড়েছিল' যে, এক লাফে তাদের স্বর্গে তুলে প্রতিশ্রুতিদাতা এই হাতুড়ে পরিত্রাতাকে তারা স্বাগত না জানিয়ে পারেনি।

যাই হোক, এবার পরিত্যক্ত প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। Social -Demokrat প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, বৃদ্ধা হাৎফেলদ লাসালের 'ইচ্ছাপত্রকে' কার্যে পরিণত করতে চান। (kreuzzeitung -এর) ভাগনার মারফৎ তিনি বিসমার্কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। নিখিল জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ Social-Demokrat

ইত্যাদি তিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ঠিক ছিল, শ্লেজভিগ-হোলষ্টাইন গ্রাস Social-Demokrat পত্রিকায় ঘোষিত হবে, বিসমার্ককে সাধারণভাবে পৃষ্ঠপোষক করা হবে ইত্যাদি। লিবক্লেখত বার্লিনে ছিলেন এবং Social-Demokrat পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলেন বলেই সমগ্র খাসা পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। যদিও চাটুকারী লাসাল পূজা, মাঝে মাঝে বিসমার্কের সঙ্গে ঢলাঢলি ইত্যাদির জন্য এঙ্গেলস ও আমি পত্রিকাখানির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি প্রসন্ন ছিলাম না, তথাপি বৃদ্ধা হাৎসফেলদের চক্রান্ত ও শ্রমিকদের পার্টির পরিপূর্ণ মর্যাদাহানি বানচাল করার জন্য আপাতত পত্রিকাখানির সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে সম্পর্ক রাখা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাই, আমরা খারাপ হালের যতটা সম্ভব সদ্ব্যবহার করেছিলাম, যদিও ব্যক্তিগতভাবে বরাবর Social-Demokrat পত্রিকার কাছে আমরা লিখে আসছিলাম যে, প্রগতিপন্থীদের মতো বিসমার্কেরও সমানে বিরোধিতা করতে হবে। এমনকি শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির বিরুদ্ধে বের্নহার্দ বেকার নামক সেই ফাঁকা ফুলবাবুটির চক্রান্তও আমরা সহ্য করে গিয়েছি। লাসালের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত মর্যাদাটা সে রীতিমতো গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছিল।

ইতিমধ্যে Social-Demokrat পত্রিকায় হের শভাইৎসারের প্রবন্ধগুলি ক্রমেই বেশী মাত্রায় বিসমার্কগন্ধী হয়ে দাঁড়াতে লাগল। ইতিপূর্বেই আমি তাকে লিখেছিলাম যে 'জোট স্থাপনের প্রশ্নে' প্রগতিপন্থীদের ভয় পাওয়ানো যেতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই, কখনও, প্রুশীয় সরকার জোট সংক্রান্ত আইনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি মেনে নেবে না। কারণ, তাতে করে আমলাতন্ত্রে ভাঙ্গন ধরবে, শ্রমিকেরা নাগরিক অধিকার লাভ করবে, চাকরবাকর সংক্রান্ত আইন (Gesindeordnung) ভেঙ্গে চুরমার হবে, পল্লী অঞ্চলে অভিজাতগণ কর্তৃক বেত্রাঘাত করা উঠে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, যেটা বিসমার্ক কিছুতেই হতে দিতে পারেন না এবং যা প্রুশীয় আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। আমি আরও জানিয়েছিলাম যে, পরিষদ যদি জোট সংক্রান্ত আইন অগ্রাহ্য করে, তা হলে ঐ আইন বলবৎ রাখার জন্য সরকারকে কথার প্যাঁচ তৈরি করতে হবে (যেমন এই ধরনের কথা যে, সামাজিক প্রশ্নটির ক্ষেত্রে 'আরও আমূল' ব্যবস্থাবলী অবলম্বনের প্রয়োজন ইত্যাদি)। এ সবই সত্য প্রমাণিত হয়। কিন্তু হের ফন শ্‌ভাইৎসার কী করলেন? তিনি এক প্রবন্ধ লিখলেন 'বিসমার্কের স্বপক্ষে এবং তাঁর সমস্ত বীরত্ব জমিয়ে রাখলেন স্থূলৎসে, ফাউখার প্রমুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে।

আমি মনে করি শ্‌ভাইৎসার কোম্পানির সদিচ্ছা আছে, কিন্তু তারা 'বাস্তব রাজনীতিবিদ'। বর্তমান অবস্থাটা নিয়েই তাঁদের যত হিসাব এবং 'বাস্তব রাজনীতির' বিশেষ সুবিধাটিকে তাঁরা মিকেল কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে দিতে রাজী নন। (শেষোক্তরা মনে হয় প্রুশীয় সরকারের সঙ্গে দহরম মহরমের অধিকারকে তাদের বিশেষ অধিকার করে রাখতে চায়।) তারা জানে প্রাশিয়ায় (এবং তজ্জন্য বাকী জার্মানিতেও) শ্রমিকদের পত্রপত্রিকা এবং শ্রমিকদের আন্দোলন কেবলমাত্র পুলিশের অনুমতিতে টিকে আছে। তাই, অবস্থাটা যা সেইভাবেই তারা তা নিতে চায়, সরকারকে বিরক্ত করা ইত্যাদি তারা, চায় না, ঠিক আমাদের 'প্রজাতন্ত্রী' বাস্তব রাজনীতিবিদদের মতোই, যারা একজন হয়েনৎসলার্ন সম্রাটকে মেনে নেয়। কিন্তু আমি 'বাস্তব রাজনীতিবিদ' নই, তাই এঙ্গেলসের সঙ্গে একযোগে আমি একটি প্রকাশ্য ঘোষণা Social-Demokrat পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রয়োজন মনে করেছি। (ঘোষণাটি আপনি শীঘ্রই কোনো না কোনো কাগজে দেখবেন।)

সঙ্গে সঙ্গে আপনি এটাও বুঝবেন কেন বর্তমান মুহূর্তে প্রাশিয়ায় আমি কিছুই করতে পারি না। প্রুশীয় নাগরিক হিসাবে আমাকে ফেরত নিতে সেখানকার সরকার সরাসরি অস্বীকার করেছেন। সেখানে আমাকে শুধু সেইভাবেই আন্দোলন করতে দেওয়া হবে, যাতে

হের বিসমার্কের আপত্তি নেই।

এখানে বসে আন্তর্জাতিক সমিতি মারফত আন্দোলন করাকে আমি শতাধিক গুণ বেশী পছন্দ করি। ব্রিটিশ প্রলেতারিয়েতের উপর এর প্রভাব হবে হবে প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন এখানে সাধারণ ভোটাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছি, অবশ্য প্রাশিয়ায় এ প্রশ্নটির যে তাৎপর্য এখানে তার তাৎপর্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এখানে, প্যারিসে, বেলজিয়মে, সুইজ্যারল্যাণ্ডে এবং ইতালিতে মোটামুটিভাবে এই সমিতির অগ্রগতি আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। একমাত্র জার্মানিতেই আমরা লাসালের ওয়ারিসদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি এঁরা: ১) নির্বোধের মতো নিজেদের প্রভাব হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত; ২) জার্মানরা যাকে বলে 'বাস্তব রাজনীতি' তার প্রতি আমার ঘোষিত বিরোধিতা সম্পর্কে অবহিত। (এই ধরনের 'বাস্তবতার' জন্যই জার্মানি সমস্ত সভ্য দেশের এত পেছনে পড়ে আছে।)

যেহেতু এক শিলিং দিয়ে কার্ড নিলেই সমিতির সভ্য হওয়া যায়, যেহেতু ফরাসীরা (বলজিয়ানরাও) এই ধরনের ব্যক্তিগত সভ্যপদ পছন্দ করে, কারণ 'এসোসিয়েশন' হিসাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় তাদের আইনে বাধা আছে; যেহেতু জার্মানির পরিস্থিতিও এর অনুরূপ —সেইহেতু আমি এখন স্থির করেছি, এখানে এবং জার্মানিতে আমার বন্ধুদের বলব যে, তারা যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই ছোট ছোট সোসাইটি গঠন করুক—সভ্য সংখ্যায় কিছু আসে যাবে না; প্রত্যেক সভ্য একখানি করে ইংলিশ সভ্য কার্ড নেবে। ইংলিশ সোসাইটি হচ্ছে আইনী সোসাইটি, তাই ফ্রান্সে পর্যন্ত এই পদ্ধতিতে কোনো বাধা নেই। যদি আপনি ও আপনার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা এইভাবে লণ্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তবে আনন্দিত হব…

## ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ৯ই অক্টোবর, ১৮৬৬

...জেনেভায় প্রথম কংগ্রেস নিয়ে আমার ভীষণ ভয় ছিল, কিন্তু মোটামুটি, আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভালই হয়েছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তার প্রতিক্রিয়া আশাতীত। আমি যেতে পারিনি এবং যেতে চাইনি, কিন্তু লণ্ডনের প্রতিনিধিদলের জন্য কর্মসূচী লিখে দিয়েছিলাম। ইচ্ছা করেই আমি কর্মসূচীটি সেইসব বিষয়েই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম যাতে শ্রমিকদের আশু মতৈক্য এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম সম্ভব হয় এবং যা শ্রেণী-সংগ্রামের এবং একটি শ্রেণীতে শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনকে সরাসরি পুষ্ট করতে ও প্রেরণা দিতে পারে। প্রুধোঁপন্থীদের ফাঁকা বুলিতে প্যারিসের ভদ্রলোকদের মাথাগুলো ছিল ভর্তি। বিজ্ঞান নিয়ে তারা বকে খুব, কিন্তু কিছুই জানে না। সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মকে, অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রামসঞ্জাত কর্মকে, সমস্ত সংহত সামাজিক আন্দোলনকে তারা ঘৃণা করে, অতএব, যাকে রাজনৈতিক উপায়ে কার্যকরী করা চলে (যেমন আইন করে শ্রমদিনের ঘণ্টা কমানো ) তাকেও তারা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। স্বাধীনতার অছিলায় এবং শাসন-বিরোধিতা বা কর্তৃত্ব বিরোধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অছিলায় এই যে ভদ্রলোকেরা ষোলো বছর ধরে নিকৃষ্টতম স্বৈরাচার সহ্য করে এসেছেন, এখনো সহ্য করছেন, তাঁরা আসলে প্রচার করছেন সাধারণ বুর্জোয়া অর্থনীতিই, শুধু তাকে প্রুধোঁমাফিক আদর্শায়িত করে নেওয়া হয়েছে! প্রুধোঁ প্রচণ্ড ক্ষতি করেছেন। ইউটোপীয়দের সম্পর্কে তাঁর ভুয়া সমালোচনা ও ভুয়া বিরোধিতা (তিনি নিজে এক পেটি বুর্জোয়া ইউটোপীয় মাত্র, অথচ ফুরিয়ে, ওয়েন প্রমুখের ইউটোপিয়ায় নূতন জগতের একটা পূর্বাভাষ ও কাল্পনিক অভিব্যক্তি রয়েছে ) প্রথমে 'ঝলমলে তরুণদের' ও ছাত্রদের

আকৃষ্ট ও দুর্নীতিদুষ্ট করে এবং পরে আকৃষ্ট ও দুর্নীতিদুষ্ট করে শ্রমিকদের, বিশেষত প্যারিসের শ্রমিকদের, যারা বিলাসিতার পণ্যোৎপাদন শিল্পের শ্রমিক হিসাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই পুরাতন আবর্জনার প্রতি দারুণভাবে মোহগ্রস্ত। অজ্ঞ, অহঙ্কারী, দাম্ভিক, বাচাল, ভুয়া ঔদ্ধত্যে ফাঁপা এই লোকগুলি সবকিছু প্রায় পয়মাল করে দিতে বসেছিল, কারণ তারা যে সংখ্যায় কংগ্রেসে এসেছিল, তাদের সভ্য সংখ্যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। রিপোর্টে আমি ওদের নাম না করে একটু ঠুকব।

একই সময় বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত আমেরিকান শ্রমিক কংগ্রেসে আমি অত্যন্ত আনন্দিক হয়েছি। সেখানকার স্লোগান ছিল পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সংগঠন, এবং খুবই আশ্চর্য যে, জেনেভার জন্য যে দাবিগুলি আমি তৈরি করেছিলাম তার অধিকাংশই সেখানেও উপস্থাপিত হয় শ্রমিকদের নির্ভুল সহজাত প্রবৃত্তির কল্যাণে।

আমাদের কেন্দ্রীয় পরিষদ-সৃষ্ট সংস্কার আন্দোলন (যাতে আমিও একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিলাম) এখন বিরাট ও অদম্য আকার ধারণ করেছে। আমি বরাবরই নিজেকে পেছনে রেখেছি এবং এখন যখন ব্যাপারটা চালু হয়ে গেছে তখন এ নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না।

## ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১১ই জুলাই ১৮৬৮

...Centralblatt প্রসঙ্গে বলতে হয়, মূল্য বলতে যদি আদৌ কিছু বোঝা যায় তাহলে আমার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেই হবে, একথা স্বীকার করে লেখকটি কিন্তু সর্বাধিক সম্ভব নতিস্বীকারই করেছে। বেচারা দেখতে পায়নি যে, আমার বই-এ 'মূল্য' সম্পর্কে কোনো অধ্যায় যদি নাও থাকত, তাহলেও প্রকৃত সম্পর্কগুলির যে বিশ্লেষণ

আমি দিয়েছি তার ভিতরই সত্যকার মূল্য-সম্পর্কের প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত। আলোচিত বিষয়টি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকেই আসছে মূল্যের ধারণাটিকে প্রমাণ করার প্রয়োজন নিয়ে এত সব কথার কচকচি। প্রত্যেক শিশুই জানে যে, কোনো জাতি যদি, এক বছরের জন্য বলব না, কয়েক সপ্তাহের জন্যও কাজ করা বন্ধ রাখে, তাহলে সে জাতি অনাহারে মারা পড়ে। প্রত্যেক শিশু একথাও জানে যে, বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার মতো এক একটা উৎপন্নরাশির জন্য লাগে সমাজের মোট শ্রমের বিভিন্ন এবং পরিমাণগতভাবে নির্ধারিত একটা একটা রাশি। এ তো স্বতঃসিদ্ধ যে, নির্দিষ্ট অনুপাতে সামাজিক শ্রম বণ্টনের এই প্রয়োজনকে সামাজিক উৎপাদনের একটি বিশেষ রূপের দ্বারা দূর করা যায় না ; বদল হতে পারে কেবল তার প্রকাশের রূপটা। কোনো প্রাকৃতিক, নিয়মকে বাতিল করা যায় না। এই নিয়মগুলি যে রূপের মধ্যে কাজ করে, সেই রূপটিই শুধু ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে। অথচ যে সমাজে ব্যক্তিগত শ্রমোৎপন্নের ব্যক্তিগত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সামাজিক শ্রমের অন্তঃসম্পর্ক অভিব্যক্ত হয়, সেই সামাজিক স্তরে শ্রমের আনুপাতিক বণ্টন কার্যকরী থাকে যে রূপেব মধ্যে, সেটা হল ঠিক এই উৎপন্নগুলিরই বিনিময়-মূল্য।

মূল্যের নিয়ম কী ভাবে কাজ করে তাই বোঝানোই হল বিজ্ঞানের কাজ। অতএব, আপাতদৃষ্টিতে এই মিয়মের বিরোধী এমন সমস্ত, ঘটনাকেই কেউ যদি একেবারে গোড়াতেই 'ব্যাখ্যা করতে' চায়, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের আগে বিজ্ঞানকে উপস্থিত করতে হবে। রিকার্ডো ঠিক এই ভুলই করেছিলেন—মূল্য সম্পর্কিত তাঁর প্রথম অধ্যায়ে তিনি আমাদের কাছে তখনও সিদ্ধ নয় এমন সমস্ত সম্ভাব্য বর্গগুলিকে আগেই ধরে নিয়ে মূল্যের নিয়মের সঙ্গে তাদের সঙ্গতি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

অপরদিকে ব্যাপারটি আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, তত্ত্বের ইতিহাস থেকে সুনিশ্চিতভাবেই দেখা যায় যে, মূল্য-সম্পর্কের ধারণা বরাবরই একই রয়েছে যদিও কমবেশী স্পষ্ট, কমবেশী মোহবিজড়িত অথবা কমবেশী বৈজ্ঞানিকভাবে যথাযথ। যেহেতু চিন্তাপ্রক্রিয়া নিজেই কতকগুলি বিশেষ সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত এবং নিজেই একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, সেইহেতু সত্যকারের সার্থক চিন্তা সর্বদাই একই থাকবে এবং পরিবর্তিত হবে শুধু ক্রমে ক্রমে বিকাশের পরিপক্কতা অনুসারে, চিন্তা করার দেহাঙ্গটির বিকাশ সমেত। বাকী সবকিছুই অর্থহীন প্রলাপ।

স্থূল অর্থনীতিবিদদের এ সম্পর্কে ক্ষীণতম ধারণাও নেই যে, বাস্তব প্রাত্যহিক বিনিময়-সম্পর্কগুলি সরাসরি মূল্যের পরিমাণের সঙ্গে সোজাসুজি এক হতে পারে না। বুর্জোয়া সমাজের আসল ব্যাপারই হচ্ছে ঠিক এই যে, সেখানে আগে থেকে (a priori) উৎপাদনের কোনো সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রন নেই। যা যুক্তিসিদ্ধ এবং স্বাভাবিকভাবে আবশ্যিক তা শুধু অন্ধভাবে কার্যকর একটা গড় হিসাবেই নিজেকে জাহির করে। আর, স্থূল অর্থনীতিবিধ মনে করেন, তিনি মস্ত বড় আবিষ্কার করছেন, যখন আভ্যন্তরীণ অন্তঃসম্পর্ক উদ্ঘাটনের বিপরীতে গর্বভরে দাবি করেন যে দৃশ্যত ব্যাপার অন্যরূপ। আসলে তাঁর গর্বটা এই যে, তিনি দৃশ্য রূপকে আঁকড়ে থাকেন এবং তাকেই তিনি চরম বলে মনে করেন। তাহলে আদৌ বিজ্ঞানের দরকার কী?

কিন্তু বিষয়টির আর একটি পটভূমিকাও আছে। একবার যদি অন্তঃসম্পর্কটি বুঝতে পারা যায়, তাহলে বিদ্যমান অবস্থার চিরস্থায়ী প্রয়োজন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধ্বসে পড়ার আগেই, তার সমস্ত তত্ত্বগত বিশ্বাস ধ্বসে পড়ে। তাই, এই চিন্তাহীন বিভ্রান্তিকে জীইয়ে রাখা হচ্ছে একান্তভাবেই শাসক-শ্রেণীর স্বার্থ। অর্থনীতিবিজ্ঞানে একেবারেই কোনো চিন্তা করা উচিত নয়, এই কথা বলা ছাড়া আর যাদের হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক তুরুপের তাস নেই, সেই সব চাটুকার

বাচালদের পয়সা দিয়ে পোষার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

কিন্তু আর না, যথেষ্ট (satis superqure)। অন্তত এটুকু দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়াদের এই পুরোহিতরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছেন; শ্রমিকেরা, এমনকি শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরাও যখন আমার বই বুঝতে পারেন এবং অসুবিধা হয় না, তখন এই 'পণ্ডিত কেরাণীরা' (!) অভিযোগ করছেন যে, আমি তাঁদের বোধশক্তির কাছে অত্যধিক দাবি করছি…

**ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস**

লণ্ডন, ১২ই এপ্রিল, ১৮৭১

…গতকাল আমরা সংবাদ পেলাম, লাফার্গ (লরা নয়) এখন প্যারিসে। সংবাদটি মোটেই সুস্থির হবার মতো নয়।

আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের' শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি, আর আগের মতো আমলাতান্ত্রিক সামরিক যন্ত্রটিকে এক হাত থেকে আর এক হাতে তুলে দেওয়া ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা হবে না, হবে ঐ যন্ত্রটিকে চূর্ণ করা এবং এই হচ্ছে মহাদেশে প্রত্যেক সত্যকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত। আর প্যারিসে আমাদের বীর পার্টি কমরেডরা ঠিক এরই চেষ্টা করছেন। এই প্যারিসবাসীদের কী স্থিতিস্থাপকতা, কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, কী স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা! বহিঃশত্রুর চেয়েও বরং আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সংঘটিত ছয়মাসব্যাপী অনাহার ও ধ্বংসের পর প্রুশীয় সঙ্গীনের তলায় তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, যেন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কখনও যুদ্ধই হয়নি এবং শত্রু যেন প্যারিসের প্রবেশ দ্বারে আর বসে নেই! ইতিহাসে অনুরূপ মহত্বের দৃষ্টান্ত আর নেই! যদি তাঁরা পরাজিত হন, তবে দোষ শুধু তাঁদের 'উদার স্বভাবের'।

প্রথমে ভিনয় এবং পরে প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশটা পিছু হটে যাবার পরই তাঁদের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ভার্সাইয়ে আসা। বিবেকের দ্বিধার জন্যই তাঁরা সুযোগ হারালেন। তাঁরা গৃহযুদ্ধ শুরু করতে চাননি, যেন 'প্যারিসকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে পাপিষ্ঠ গর্ভস্রাব তিয়ের আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেননি! দ্বিতীয় ভুল ; কমিউনকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটাও সেই অতিরিক্ত রকমের সততার কুণ্ঠা থেকে! সে যাই হোক না কেন, পুরানো সমাজের নেকড়ে, শুয়োর ও কুত্তাগুলো যদি প্যারিসের এই বর্তমান অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করে দেয়ও, তবুও জুন অভ্যুত্থানের পর এই অভ্যুত্থানই হল আমাদের পার্টির সবচেয়ে গৌরবময় কাজ। স্বর্গাভিযানী এই প্যারিসবাসীদের তুলনা করুন সেই জার্মান-প্রুশীয় পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের দাসদের সঙ্গে, যে সাম্রাজ্যের মান্ধাতার আমলের ছদ্মবেশনৃত্য ভরে উঠেছে ফৌজী ব্যারাক, গির্জা, য়ুঙ্কারতন্ত্র এবং সর্বোপরি কুপমণ্ডুকতার দুর্গন্ধে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। লুই বোনাপার্টের কোষাগার থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্যপ্রাপ্তদের নামের যে তালিকা সরকারীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে লেখা আছে ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে ফগ্ত ৪০,০০০ ফ্রাঁ পেয়েছেন! পরে ব্যবহারের জন্য তথ্যটা আমি লিবক্লেখতকে জানিয়েছি!

তুমি আমাকে হাকস্তহাউজেন পাঠাতে পারো, কারণ সম্প্রতি আমি শুধু জার্মানি থেকে নয়, এমনকি সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকেও অক্ষত অবস্থায় নানাধরনের পুস্তিকাদি পাচ্ছি।

যেসব সংবাদপত্র পাঠিয়েছ তজ্জন্য ধন্যবাদ ( অনুগ্রহ করে আরো পাঠাবে, কারণ জার্মানি, রাইখস্টাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে চাই )...

## ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১৭ই এপ্রিল, ১৮৭১

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমার হাত-ভর্তি কাজ। তাই, মাত্র দুয়েক কথা লিখব। তুমি কেমন করে ১৮৪৯-এর ১৩ই জুনের পেটি বুর্জোয়া মিছিল ইত্যাদির সঙ্গে প্যারিসের বর্তমান সংগ্রামের তুলনা করতে পারো তা মোটেই বোধগম্য নয়।

শুধু অব্যর্থ অনুকূল সুযোগের শর্তেই যদি সংগ্রাম শুরু করা যেত, তাহলে তো দুনিয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করা সত্যই খুব সোজা হয়ে যেত। ওদিকে আবার 'আকস্মিকতার' যদি কোনো ভূমিকা না থাকত তাহলে ইতিহাস অত্যন্ত অতীন্দ্রীয় প্রকৃতির হয়ে উঠত। এই আকস্মিকতা স্বভাবতই সাধারণ বিকাশধারারই অংশ এবং অন্যান্য আকস্মিক ঘটনা দিয়ে তাদের পরিপূরণ হয়ে যায়। কিন্তু বিকাশধারার ত্বরান্বয়ণ অথবা বিলম্বন খুব বেশী পরিমানে নির্ভর করে এই ধরনের 'আকস্মিকতার' উপর। যাঁরা গোড়াতেই আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের চরিত্রও এই 'আকস্মিকতার' অন্তর্ভুক্ত।

এবারের স্পষ্টতই প্রতিপূল 'আকস্মিকতাটা' কিন্তু কোনোক্রমেই ফরাসী সমাজের সাধারণ অবস্থার মধ্যে নয়, ফ্রান্সে প্রুশীয়দের উপস্থিতি এবং প্যারিসের ঠিক সম্মুখেই তাদের অবস্থানের মধ্যে। প্যারিসবাসীরা একথা ভালভাবেই জানত। ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া ইতরগুলিও সেকথা ভালভাবেই জানত। ঠিক সেইজন্যেই তারা প্যারিসবাসীদের সম্মুখে হয় লড়াই অথবা বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ এই গত্যন্তরই খোলা রেখেছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর যে হতাশা আসত তা যে-কোনো সংখ্যক 'নেতার' মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হত। প্যারিস কমিউনের কল্যাণে পুঁজিপতি শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এক নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এর আশু পরিণাম যাই হোক না কেন, বিশ্ব ঐতিহাসিক গুরুত্বের একটা নতুন যাত্রা-বিন্দু লাভ করা গেছে।

———